আর দেখিব না; যাহা শুনিয়াছি, তাহা আর শুনিব না। সে যে নিজেরই উপাসনা, নিজেরই ভজনা। নয়ন অপরের নয়নে, অন্তর অপরের অন্তরে, আপনাকে প্রতিবিম্বিত দেখিতে চাহে। কেবল প্রকৃতিদর্পণ, কেবল অতীতের স্ফটিক গোলক, লইয়া চলে না। প্রত্যেকেই তাহার স্বজাতির রূপে আপন স্বরূপ অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়। তাই স্বজাতির সহিত না মিলিলে প্রাণের রূপ দেখিব কেমন করিয়া ?

বসন্তের ফুল ফোটে ও ঝরিয়া পড়ে, আকাশের চন্দ্র সূর্য্য মাসের পর মাস, বরষের পর বরষ, আসে যায়, সৌরজগতের পর সৌরজগত জলবুদ্বুদের ন্যায় উঠে, ভাসে ও মিলায়। কিন্তু এ আবর্ত্তও এক চিরন্তন ধারার অন্তর্ভূত। অনাদি অনন্ত কালপরম্পরায় যে ধারা আছে, মাস, ঋতু, বর্ষ তাহারই অঙ্গ। বসন্তের ফুল তাহারই অলঙ্কার। আমি কোন্ ধারা হইতে অংশে অংশে নিত্য নূতন বেশে গমনাগমন করিতেছি ? আমার ধারা কোথায়!

প্রাণই প্রাণের স্বজাতি। তবে প্রাণবিশিষ্টের সমষ্টিই কি আমার ধারা ? কে সে বিশ্বপ্রাণ ? কোথায় সে প্রাণময় ?

সাংখ্য দর্শনে বলে যে একই শক্তি বুদ্ধিরূপে পরিণত হইয়া, পরে সেই বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত চেতনের প্রেরণায় সৃষ্টি প্রক্রিয়া আরম্ভ করে, ও ক্রমনিয়মানুসারে অণুপরমাণু তৃণলতা কীটপতঙ্গ পশুপক্ষী প্রভৃতির ভিতর দিয়া সর্ব্বশেষে মানব দেহে প্রাণের প্রাণরূপে অবস্থান করে। এবং পুনরায় স্বভাবের নিয়মে বিপরীত ধারায় জড়ে পরিণত হয়। মানব সেই মহাশক্তির আবর্ত্তনে আদি ও অন্তের সংশ্লেষস্থল। জানি না কোন স্রোতে কোন পথে ভাসিয়া আসিয়াছি, তবে একদিন আমার জাগ্রত চৈতন্য বিপরীত গতিতে সেই প্রাণময়ের সন্দর্শনে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া আত্মহারা হইয়াছিল। সাংখ্য যোগে যাহাকে "প্রকৃতিলয়" বলে আমার কি সেই যোগাবস্থা ঘটিয়াছিল ? না—সেদিন প্রকৃতি আমায় গ্রাস করে

নাই। প্রাণময়েই প্রাণ লয় প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতিতে নয়। আমারও তাহাই ঘটিয়াছিল।

আজ সেই অতলস্পর্শ হইতে ভাসিয়া উঠিয়াছি। আজ বন্যা-স্রোতে ভাসমান হইয়া কিনারায় ঠেকিয়াছি, এই মাত্র পারে উঠিয়াছি।

সম্মুখে দেখি নূতন জগৎ, যেন এক বিরাট হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইতেছে। এই বিরাট প্রাণীসমষ্টি বক্ষে ধারণ করিয়া এ কোন মহাপ্রাণী কালপথে মহাযাত্রা করিয়াছে। এই মানব ইতিহাসের ধারা, কোথা হইতে আসিতেছে, কোথায় চলিতেছে? ব্যোম-মার্গে ঐ তারকামণ্ডলের ধারা, আর মর্ত্তে এই সমাজজীবনের ঐতিহাসিক ধারা। ইহাই মহাপ্রয়াণের প্রশস্ত পথ। আমি এই মহাযাত্রা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াই দিশাহারা, বিভ্রান্ত, হইয়াছিলাম।

আজ বুঝিতেছি এই বিচিত্র বিশ্ব ধারার সহিত অন্তরের আদর্শের সামঞ্জস্যে দর্পণদ্বয়গত প্রতিবিম্বপরম্পরার ন্যায় একটী জীবনধারা সৃজন করিতে হইবে। এমনি করিয়াই বিশ্বদর্পনে প্রাণের রূপ প্রতিফলিত হয়, ও এক অখণ্ড অনন্ত ধারা সৃজন করে। ইহাই প্রাণের শিল্প-কৌশল। এতদিন বসিয়া বসিয়া স্বভাব লীলা দেখিলাম, আজ আর রঙ্গাভিনয়ে দর্শক নহি। আজ আমি অভিনয়ে সূত্রধার। অথবা আজ আমি শিল্পী। ভাঙ্গিতে আসিয়াছি। ভাঙ্গিয়া গড়িয়া লইতে আসিয়াছি। আজ এই ভগবদ্দত্ত বিশ্বস্তূপের পার্শ্বে বসিয়া ভাবিতেছি ইহাদ্বারা কোন অপূর্ব্ব বস্তু রচনা করি। চিত্রকর পটে রং ফলাইবার জন্য তুলি ধারণ করেন। ভাস্কর খনিজ পদার্থ দিয়া মূর্ত্তি গঠন করেন। আমার এই অভিনব শিল্পে অচেতন পদার্থ উপকরণ নয়। বিশ্বপ্রাণই আমার উপাদান। আমি এই চেতন পদার্থ দিয়া যে মূর্ত্তি গঠন করিতেছি, তাহা কেহ দেখিবে না, কেহ বুঝিবে না, তাহার রস কেহ উপভোগ করিবে না। আমি সাকার পদার্থ দিয়া নিরাকার গড়িয়া তুলিতেছি। তাহা বিশ্ব-

মানবের জন্য নহে। তাহা বিশ্বপতির স্বপত্যাগারে এক কোণে স্থান পাইলেই আমার শিল্পচেষ্টা সার্থক হইবে।

রসই শিল্পীর প্রাণ। কিন্তু এই রস, এই প্রাণ, যে নিরাকার। শিল্পী যখন তাহার শিল্পবস্তুটিকে গড়িতে থাকে, তখন সে ত রসের কথা, প্রাণের স্বরূপ, একেবারেই ভাবে না, ধ্যান চক্ষেও দেখে না। সে যে জ্ঞানান্ধ। চিত্রকর ও রং যে আলাহিদা, চিত্রকরের সে জ্ঞানও থাকে না। সে শুধু ঐ রংএর মধ্যে প্রবেশ করে, এবং নানা রং লইয়া মিলাইতে থাকে; কখনও সাদা, কাল, লাল, কখন নীল, সবুজ, হলদে, কখন মেটে, কমলা, গোলাপী, আর এই মিলাইতে মিলাইতে পটের উপর তুলি দিয়া আঁচড় কাটিতে থাকে, আঁচড়ের পর আঁচড়, টিপের পর টিপ, ও এইরূপে আগে দেহের কাঠাম, তারপর মুখ, ও পরে হাত পা যোগ করে, এবং ক্রমে ক্রমে তাহাতে চোখ নাক ফুটাইয়া তুলে, ও অবশেষে কেমন করে কোথা হোতে এক ছন্দোবদ্ধ পূর্ণাবয়ব মূর্ত্তি ওই পটের উপর প্রাণময় হইয়া জাগিয়া উঠে। আমিও আজ নানা রং মিলাইয়া এক নূতন রং সৃষ্টি করিতেছি। তাই আমাকে রংএর সহিত রং সাজিতে হইবে। রঙ্গীন না হোলে রংরাগী হইব কেমনে? এই জগতের সকল রং লইয়া, সাদা ও কাল, মেটে ও উজ্জ্বল, সৎ ও অসৎ, কুৎসিত ও সুন্দর, সকল রংএ আমার রং মিলাইয়া, সকল রাগ আমার রক্তে রঞ্জিত করিয়া, এক অভিনব চিত্রকলা সাধন করি।

তাই বলি বর্ণভঙ্গিমাই সকল সৃষ্টির মূলে। শুধু আমি রঙ্গীন নই। সৃষ্টিও যে লোহিতশুক্লকৃষ্ণরূপা। চিত্রকর যেমন চিত্রের রং রং'এ প্রবেশ করিয়া থাকেন, সেইরূপ বশ-ছবির বর্ণে বর্ণে, রেখায় রেখায়, নীলে সবুজে, সাদায় কালোয়, ফিকে ঘোরে, মেটে উজ্জ্বলে সেই শিল্পী রংএ রং মিলাইয়া আছেন। তিনি যে রংরাজ!

মন, কর সেই শিল্পের সাধন। একদিন এই শিল্প সাধনা করিতে করিতে এমন এক মুহূর্ত্ত আসিবে, যখন

বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার শিল্পপ্রদর্শনীতে উপস্থিত হইবেন। তখন আমার শিল্পাগারের কাজ হইতে অবসর মিলিবে। সেই দিন এই ভাঙ্গাগড়ার ভার, এই গড়িয়া তোলার ভার, সেই বিশ্ব-শিল্পীর হাতে দিয়া আমি নিশ্চিন্ত থাকিব। তিনি ভাঙ্গিতে থাকুন, গড়িতে থাকুন, ভাঙ্গিয়া গড়িয়া এই বিশ্বব্যূহ রচনা করিতে থাকুন। আমি কেবল বসিয়া বসিয়া সেই বিশ্বকর্ম্মার হাতের কৌশল দেখিব।

তাই আজ বিশ্বস্তূপের একপার্শ্বে বসিয়া ভাবিতেছি ইহার দ্বারা কোন অপূর্ব্ব শিল্পবস্তু রচনা করি।

শ্রীসরযূবালা দাসগুপ্তা।

নারায়ণ

মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

সম্পাদক

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ।

প্রথম বর্ষ ১ম খণ্ড দ্বিতীয় সংখ্যা

পৌষ, ১৩২১ সাল।

সূচী পত্র

কার্য্যালয়—১৪৮ নং রসা রোড (সাউথ), কালীঘাট, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সমেত ৩৷৹ টাকা।

এই সংখ্যার নগদ মূল্য ।৹ আনা, ডাক মাশুল ৴৹ আনা।

বিজয়া প্রেসে, ২০ নং পটুয়াটোলা লেনে,
শ্রীরমেশচন্দ্র চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নারায়ণ

১ম বর্ষ—২য় সংখ্যা]   [পৌষ, ১৩২১ সাল

ফাঁকা

চল্ চল্ চল্, সাম্‌নে চল্।

চলাই আমার ধর্ম্ম। তাই ক্রমাগত চলিতেইছি। নদীর স্রোত যেমন বহিয়া যায়, শূন্যে বায়ু যেমন অনবরত সঞ্চালিত হইতে থাকে, সময় যেমন আর ফুরায় না, তেমনি আমারও আর চলার শেষ হয় না। কিন্তু ইহারা অবিরাম একভাবেই চলিয়া যায়; আমি তাহা পারি না। আমি চলিতে চলিতে এক একবার থামিয়া লই। কাব্যের ছন্দে ছন্দে যেমন যতি, রাগিণীর তালের পর সম, হৃৎপিণ্ডের ঘাত প্রতিঘাতের মাঝে একটি বিরাম, আমার গতিতেও তেমনি এক একটি অবকাশ। তাই আমি থেকে থেকে থেমে থেমে চলি। নহিলে আমার তাল কাটিয়া যায়।

কিন্তু কবিতাটির ঝঙ্কার আস্বাদ করিতে যেমন তাহার স্বরবিন্যাস ও যতি গুলিকে ছন্দের সুরে গাঁথিয়া লই, গানের সুরটি আয়ত্ত করিতে হইলে যেমন তাহার স্বরপরম্পরার এককালীন মানস অনুভূতি আবশ্যক, সেইরূপ জীবনটিকে পূর্ণ করিয়া পাইতে হইলে তাহার গতি ও অবকাশগুলিকে মিলাইয়া বুঝিতে হয়। তাই আজ আমার জীবনের গতি ও অবকাশগুলিকে মিলাইয়া দেখিতে বসিয়াছি। এই গতি ও অবকাশ উভয়ই যে আমার জীবনের অঙ্গস্বরূপ।

যখন হইতে চলিতে শিখিয়াছি, তখন হইতেই একটু জ্ঞানের আভাস আসিয়াছে। কিন্তু তার আগে নিশ্চয়ই আমার একটা মস্ত অবসর ছিল। এবং সেই অবসর ছিল মাটির মত অসাড়, আকাশের মত অবাধ, অনন্তকালের মত স্থির। আর সেই তল-হীন অসাড়তার অতলে, সেই চির আঁধারে, আগুন যেমন চক্‌মকির ঘর্ষণের অপেক্ষায় অথবা তুষারমণ্ডিত হিমাদ্রিশিলা যেমন সূর্য্যোদয়ের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকে, আমার প্রাণশক্তিও সেইরূপ নিয়তির ভবিষ্যবাণীর প্রতীক্ষায় নিঃসাড়ে অকালনিদ্রায় মগ্ন ছিল কিন্তু একদিন সেই অকাল-নিদ্রার অবসানে চৈতন্য কালজ্ঞানরূপে ভাসমান হইল, তথাপি জড়তার খনিতে যাহার উৎপত্তি তাহার জড়তা দূর হইল না। সে আপনাকে কিছুকাল সর্ব্বকর্ম্মের অতীতে রাখিয়া শুধু মূক সাক্ষীরূপে অবস্থান করিল। কর্ম্ম হইতে অবসর প্রাপ্ত ব্যক্তি যেমন বিনা কাজে বৃত্তি উপভোগ করিয়া থাকেন, সেও সেদিন একপার্শ্বে বসিয়া বিশ্বের কৌতুকময় বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হইয়া রহিল।

কে বলিবে কেমনে সেই চিরপুরাতন জড়তায় শক্তির আবেশ আসিল। দেখিতে দেখিতে দূর হইতে এক কল্লোলময় প্রবাহ আসিয়া তাহাতে অনুপ্রবেশ করিয়া সেই শূন্য জড়রাজ্যকে যেন এক উদ্বেলিত কারণসাগর করিয়া তুলিল। সেই কত যুগের অলীক স্বপ্ন, সেই অঘোর ঘুমঘোর, তমসার আবেশ, কোথায় ভাসিয়া গেল। এবং সেই কারণসাগর হইতেই 'আমি'র উদয় হইল। কে যে আমাকে "আমি আছি" বলিতে শিখাইল জানি না, কিন্তু সেদিন আমি স্বেচ্ছায় সজোরে বলিয়া উঠিলাম "আমি আছি"।

তখন দেখি আমারও সেই প্রবাহের ন্যায় ছুটিয়া চলিবার শক্তি আছে। আমি এখন চলিতে আরম্ভ করিলাম। এবং আমার চলার সঙ্গে সঙ্গে মাটি ও আকাশের বিভাগ হইল, মাটিতে কত নূতন সৃষ্টির আবির্ভাব হইল, আকাশ সূর্য্যচন্দ্রনক্ষত্ররাশিকে বুকে

করিয়া ঘুরিতে আরম্ভ করিল, আর সময় খরচের হিসাব না রাখিয়া দৌড়াইতে লাগিল। গিরি-কন্দর-বহির্ভূত নবীন প্রস্রবণের ন্যায় আমিও আমার স্বচ্ছ প্রাণটির সহিত নানা ছলে নানা কৌশলে খেলিতে খেলিতে ছুটিতে লাগিলাম। নদীর স্রোত বহিতে বহিতে সাগর-সঙ্গমে প্রাণ হারাইয়া ফেলে; আমি কিন্তু লীলা করিতে করিতে মধ্যপথে আসিয়া ঠেকিয়া গেলাম। সেদিন আমার সকল শক্তি—যাহা সেই শক্তি-প্রদায়িনী ধারা হইতে অর্জ্জন করিয়াছিলাম—তাহা সব নিঃশেষ হইয়া গেল। জলাভূমিতে মরাগাঙ্গের ন্যায় আমি সেই মধ্যপথে প্রাণ হারাইলাম। আমার চলা বন্ধ হইলে, সেদিন আমার সঙ্গে সঙ্গে সকল পার্থিব বস্তুর গতির রোধ হইল। আকাশেরও ঘোরা বন্ধ হইয়া গেল। এই হইল আমার গতিতে প্রথম বিরাম, জীবনে প্রথম অবকাশ।

আমি থামিয়া রহিলাম। বীজটি রোপণ করিবার পর অঙ্কুর হইয়া দেখা দিবার আগে কিছুদিন মাটিতে থামিয়াই থাকে। ধানটি পাকিলে কাজে লাগিবার আগে অন্ততঃ কয়েক মাস কৃষকের গোলা ভরিয়াই থাকে। বাষ্প পুনরায় বারিধারা হইয়া বর্ষিত হইবার পূর্ব্বে কিয়ৎকাল আকাশে অদৃশ্য হয়। তাই, বিশ্বে চেতন অচেতন সকল পদার্থে, এমন কি অণু-পরমাণুর মধ্যেও গতির পর বিরাম দেখা যায়। আর আমি যেমন সকল শক্তি খোয়াইয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া মাঝ দরিয়ায় ডুবিয়াছিলাম, তাহাদেরও এক সময় আসে যখন হায়রাণ হইয়া তাহারা মাটির সঙ্গে মাটি হইয়া মিশিয়া যায়। আর সেই কারণেই মাটির এমন সৃজনী শক্তি, সে যে সকল শক্তির আশ্রয়স্বরূপ, লয়ভূমি।

আমার সেই শক্তি-প্রদায়িনী প্রবাহিণী, সে কোন শূন্যে থাকে? সেই শূন্যে, সেই কারণ-সাগরে, না ডুবিলে শক্তি সঞ্চয় করিব কেমনে? এ জগতে সবাই যেখান হইতে আসে সেখানেই ফিরিয়া যায়। সেই স্থানটি মূলাধার। তাহাই বিরামভূমি। তাই বিরামের

পর সকল বস্তুই প্রাণময় হইয়া উঠে। তাই কাব্যের ছন্দে ছন্দে যতিই প্রাণ, তাই রাগিনীর তালের মাঝে মাঝে সমই সঙ্গীতজ্ঞের মাতন। আমার গতিতেও সেইরূপ অবকাশই শক্তি, অবকাশই মুক্তি।

কিন্তু এই বিরামের ক্রোড়ে কোথায় থাকি, কি ভাবে অবস্থান করি, তাহা আমার অনির্ব্বচনীয়। যেন পাখীর ডিমের ভিতর থাকা। অথবা যেমন চিত্রটি অঙ্কিত হইবার পূর্ব্বে চিত্রকরের কল্পনায় সেই চিত্রের চাক্ষুষ আভাস ভাসে ভাসে—ভাসে না, অথবা রচনাটি লিপিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে লেখকের কাণে তাহার সুরটি বাজে বাজে—বাজে না। আমার অবকাশগুলিও ঠিক সেইরূপ। যেন শক্তির বীজ গর্ভে ধারণ করিয়া থাকে। সেই অবসর হইতেই আজ আমি পুনরায় চলিবার শক্তি পাইয়াছি।

"চল্ চল্ চল্, সামনে চল্"।

অবসর কাটিয়া গেল। আমি সেই শূন্যের মাঝ হইতে ভাসিয়া উঠিলাম। এখন আমি কেবলই ভাসিয়া যাইতেছি। দূরে, দূরে, আরও দূরে। ক্রমেই আকাশের পর আকাশ পার হইয়া ভাসিয়া যাইতেছি।

অনাদি কাল হইতে এই শূন্যের মাঝে পথ কাটিয়া কাটিয়া, কোথায়, কোন আদর্শের কল্পনা লইয়া চলিতেছি! শুধু আমি নয়; আমার বিশ্বগোলকও আমাকে যুগে যুগে অনুধাবন করিতেছে। কিন্তু কই আদর্শের রহস্য ঘুচিল কই? দিনে দিনে ত আদর্শ বাড়িয়া যাইতেছে। জ্ঞান যতই বাড়িতেছে, আদর্শের রহস্য ততই জটিল হইতে জটিলতর হইতেছে।

যেমন দ্রষ্টা কোনও স্থান অধিকার করিয়া চতুর্দ্দিকে যতদূর দেখে তাহাই তাহার দিঙ্‌মণ্ডল। সে যদি উচ্চতর ভূমিতে দাঁড়ায়, তবে তাহার দিঙ্‌মণ্ডলের আয়তন পূর্ব্বের তুলনায় প্রসারিত হয়। কিন্তু দ্রষ্টা পৃথিবীর উপর দাঁড়াইয়া দেখে, পৃথিবীকে ছাড়াইয়া যায় না। তাই সে পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছিল, তাহা এখন যাহা

দেখিতেছে তাহার অন্তর্গত হইয়া থাকে। তাহার দিঙ্‌মণ্ডলের সীমানা বৃহত্তর হইলেও, সেই পূর্ব্বদৃষ্ট বৃত্তের সহিত একই সম-তলের অন্তর্ভুক্ত। আমার কিন্তু তাহা নয়। যদিও আমার আকাশ দিনে দিনে বাড়িয়া যাইতেছে, তবু আমি যাহা পূর্ব্বে দেখিতেছিলাম এখন আর তাহা দেখি না;—আমি ক্রমেই উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতরে উঠিতেছি। ধরাতল আমার পদতল হইতে খসিয়া যাইতেছে। বায়স্কোপ যন্ত্রের পরতগুলি যেমন এক একটি করিয়া চক্ষের উপর দিয়া ভাসিয়া যায়, সেইরূপ কত বিচিত্র দৃশ্যাবলী ভাসিয়া গেল, কত ক্ষেত্র, কত অরণ্যানী, কত নদী, কত হ্রদ, কত উপত্যকা, কত অধিত্যকা, কত শিখরের পর শিখর, বায়ুমণ্ডলের পর বায়ুমণ্ডল, কত গোলকের পর গোলক, আমার দৃষ্টি হইতে সরিয়া গেল। কত সৌরজগতের পর সৌরজগৎ, কত তারকামণ্ডলের পর তারকামণ্ডল, একে একে পার হইয়া কোথায় উঠিতেছি। কত লোকের পর লোক, স্বর্গলোক, তপোলোক, ব্রহ্মলোক সেই সপ্ত-লোক অতিক্রম করিয়া আসিলাম। কত আলোক আঁধার, আঁধার আলোক, কত রং বেরং, সেই শুক্ল লোহিত কৃষ্ণ, সেই লোহিত কৃষ্ণ শুক্ল, সেই কৃষ্ণ লোহিত শুক্ল, কতবার কতভাবে মিলাইয়া যাইতে যাইতে যেন আজ সব সাদা, ফাঁকা হইয়া আসিতেছে।

এই ব্যোমমার্গই কি সত্যাদর্শের পথ? আমি আজ সেই পথেরই পথিক, কিন্তু কৈ এ পথ ত চলিয়া শেষ করিতে পারি না! যতই উঠি না কেন, সে নিত্যধাম ত নিকটে আসে না। বালক যেমন মাঠে দাঁড়াইয়া অদূরে মাটি ও আকাশের সীমানা দেখিয়া তাহার দিকে ছুটিতে থাকে, আমিও তেমনি যে আদর্শের পিছে ছুটিয়া আসিলাম, আজ বুঝিতেছি সে স্থানে পৌঁছিবার শক্তি আমার নাই। সে আদর্শ আমার জ্ঞানে একটি পরপারের রহস্য হইয়াই থাকিবে। সে যে পরব্যোম, অনাদি, অনন্ত, ভূমা, তুরীয়, আমার সকল শক্তি সকল জ্ঞানের অতীতে। তাহাকে ত সীমানার

মধ্যে আনা যায় না, তাই সে যেমন তেমনি রহিল, মাঝ থেকে পৃথিবী ও বৈকুণ্ঠধামের ব্যবধানটাই বাড়িয়া গেল। পৃথিবী পাতাল হইয়া নীচে পড়িয়া গেল। আর সেই বৈকুণ্ঠধাম মাঝের আকাশ ছাড়িয়া উর্দ্ধাৎ উর্দ্ধে উঠিয়া গেল!

আমি নীচে ঐ পাতালে আঁধারেই ছিলাম। শুনিয়াছিলাম বৈকুণ্ঠধাম নাকি আলোকময়, তাই পাতাল ছাড়িয়া পাতাল ও বৈকুণ্ঠধামের মাঝখানে মর্ত্ত্যে একটুখানি জায়গা দখল করিলাম। উপরের অজ্ঞেয় রহস্য ও নীচে পাতালের কথা ভাবিতে ভাবিতে দুঃখময়ের সেবায় কাল কাটাইতাম। কিন্তু সে মর্ত্ত্যের টান ছাড়া হইয়া আজ যেখানে আসিয়াছি সেখান হইতে কিছুই দেখিতে পাই না। "আরও আরও আলোকের" আশায় এত পথ চলিয়া আসিলাম, কিন্তু কৈ আলোক ত পাইলাম না, এ যে আঁধার হ'য়ে এল। এখন দেখিতেছি যত আলোকের মেলা, যত রংএর ছটা, ওই মাঝ পথেই। মাঝপথ ছাড়িলে সব আঁধার।

আমি সেই মাঝপথ ছাড়িয়া আসিয়াছি। তাই আমার বিশ্বছবি মুছিয়া গেল। সেই হরিদ্বরণ শোভা, সেই নীলাকাশ, সেই শুভ্রফেন অতল জলধি, কোথায় কোন শূন্যসাগরে মিলাইয়া গেল। আমার নয়নের দৃষ্টি ঘোলা হইয়া আসিতেছে। আমার বর্ত্তমান সেই অনতীত অতীতের নিশায় মিলাইয়া যাইতেছে। ভবিষ্যতের আশা একদিন প্রত্যক্ষ-জীবন বর্ত্তমান হইয়া উঠিবে ভাবিয়া ছিলাম, কিন্তু এখন দেখিতেছি বর্ত্তমান শেষে অতীতেই মিলায়।

ইহাই জগতের নিয়ম। বীজ হইতে ফলের সৃষ্টি, কিন্তু ফলের পরিণতি পুনরায় সেই বীজে। ভাব হইতে ভাষা, কিন্তু ভাষার উদ্দেশ্য পূর্ব্বজ ভাবকে জাগাইয়া তোলা। অরূপ হইতে রূপের বিলাস, কিন্তু রূপের লয় সেই পুরা-তন অরূপেই। ইহাই বিলোমগতি। এই বিলোম পথ অনুসরণ করিয়াই দেহী প্রাণ একদিন বিদেহ প্রাণময়ের রাজ্যে উপস্থিত হয়।

আমি ত এই পথেই আসিলাম। এখন দেখি যে প্রাণময়ের রাজ্য ঝাঁকা। আমি সেই ঝাঁকারাজ্যেই আসিয়াছি। সব আলোক আঁধার মিশাইয়া গিয়াছে। কোথাও ছায়ার লেশ মাত্র নাই, যেন উপর হইতে নিরাবরণ আবরণ নামিয়া আসিয়া আমায় ঘেরিয়া ফেলিল। এই কি পথের শেষ? চক্ষু বুজিয়া আসিল, হাত পা অবশ হইয়া আসিতেছে, সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ করে। সেই যে আদিতে "আমি আছি" বলিয়া স্বেচ্ছায় স্থানটি অধিকার করিলাম, সে স্থানে নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিলাম কৈ? সকল আকর্ষণ বিকর্ষণের উপরে আমার যে একটি নিজের শক্তি ছিল, আজ সে শক্তি অবসন্ন হইয়া আসিতেছে; আজ সে শক্তি অনাথা, এই টানাটানির ঝোঁকে নিজের টানটি হারাইয়া ফেলিতে বসিয়াছি। আর পারি না, আর সামলাইতে পারিলাম না। এ কিসের করাল টানে শূন্য অম্বরে উল্কার ন্যায় পড়িতেছি। পড়িতেছি, ক্রমাগত পড়িতেইছি। গেলাম গেলাম বুঝি পাতালেই পড়িয়া গেলাম। কোথায় পড়িলাম কিছুই জানি না।

চক্ষু মেলিয়া দেখি, আমি যে মর্ত্ত্যে আমি সেই মর্ত্ত্যে। দিবালোকে আমি অস্বপ্নের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম।

চল্ চল্ চল্, সাম্‌নে চল্।

কিন্তু কৈ এত পথ চলি স্বপ্নের ঝোঁক ত যায় না। যেন স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে নিশিপাওয়া ব্যক্তির ন্যায় পথ চলিতেছি।

চল্ চল্ চল্, সাম্‌নে চল্।

প্রত্যেক প্রাণীর চক্ষের অন্তরালে ভাসে এম্নি একটি আভাস, এম্নি একটি স্বপ্ন। কবে যেন একখানা বিশ্বদর্পণ ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে, এখন তাই প্রত্যেক জীবে, সকল স্থাবর-জঙ্গমে, এক একটি খণ্ড আদর্শ ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। তাই আজ ভুবনে আদর্শের প্রতিভাস নানা; নানা ভঙ্গিমায় নানা রঙ্গিমায় বিস্ফুরিত। চরমে যে বস্তুর সহিত যাহার সঙ্গমলিপ্সা, যে যাহাকে ধ্রুবতারার

মত লক্ষ্য করিয়া তাহার কক্ষস্থিত গ্রহের ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার দিকে ধাবিত হয়, সেই পরম বস্তুর আভাসই তাহার জীবনের আদর্শে প্রতিফলিত। সে আদর্শে ভালমন্দ বিচার নাই, সুন্দর কুৎসিতের বিচার নাই, সত্য মিথ্যা, ন্যায় অন্যায়ের বিচার নাই। সে যে সকল বিচারের উপরে। গ্রহ যেমন মন্দোচ্চ গতিতে তাহার নিজ কক্ষে ভ্রমণ করে, আদর্শ-প্রতিভাসও সেইরূপ মর্ত্ত্যদৃষ্টিতে কখনও উর্দ্ধগামী, কখনও অধোগামী। সে কিন্তু উর্দ্ধাধোবিভাগের বাহিরে। সে খণ্ড আদর্শ প্রত্যেক প্রাণে স্বতন্ত্র। আর জগতের আদর্শ সেই খণ্ড আদর্শের সমষ্টি বই কিছুই নয়। সকল তারকামণ্ডলই ত একটি কেন্দ্র-তারার অভিমুখে যাত্রা করিতেছে। সেইরূপ মানবসমাজরূপী মহাপ্রাণীর লক্ষ্য হইল সকল জীবের লক্ষ্যসমষ্টির লক্ষ্যমাত্র। এবং সেই কারণে মনুষ্যচরিত্রে যাহা সম্ভব, মনুষ্যস্বভাব যে যে উপাদানে গঠিত, সে সকলই, অর্থাৎ ভাল মন্দ, সত্য মিথ্যা, ন্যায় অন্যায়, প্রণয় অপ্রণয়, আশা নিরাশা, সুখ দুঃখ, আনন্দ নিরানন্দ, সকলই এই ভগবৎ আদর্শের অন্তর্গত হইয়া আছে। বৈকুণ্ঠে ভগবান যাহাই হউন, বিশ্বের ভগবান, তোমার আমার উপাস্য, মুক্ত পুরুষ নহেন। তিনি আমাদেরই মত, আমাদেরই সহিত,—নিরন্তর সিদ্ধির জন্য সাধনা করিতেছেন। আর এই সিদ্ধির পথে উত্থান পতন আছে। তাই বিশ্বপথ ত সোজাপথ নয়। সে যে ভুজঙ্গগতি (curvi-linear), কুণ্ডলাকৃতি (spiral)।

এই সমষ্টিরূপী আদর্শই বিশ্বচক্ষে স্বপ্নের ন্যায় ভাসিতেছে, কোন অলীক শিবসুন্দরের স্বপ্ন নহে। এই বাস্তব ভগবানই জগৎরূপী মহাপ্রাণীর জীবনের গতির কারণ। আর এই বাস্তব আদর্শ অনুধাবন করিতে করিতেই জগৎ দিনে দিনে নূতন মার্গে আসিয়া পড়িতেছে, কত নূতন তত্ত্ব, নূতন জ্ঞান, নূতন ইচ্ছা, নূতন শক্তি, নূতন প্রাণ, দিনে দিনে এই বাস্তব ভগবানে বাড়িয়া উঠিতেছে। ইহাই ঐতিহাসিক আদর্শ মার্গ।

চল্ চল্ চল্, সামনে চল্।

আমার চলায় জগৎও চলে। যেমন কোন নাবিক সাহসমাত্র সম্বল করিয়া আপন জাহাজে এক অজানা পথে উত্তর অথবা দক্ষিণ মেরু অভিমুখে—যে দিকেই হউক, কোন এক দিকে মুখ রাখিয়া বরাবর সোজাসুজি যাত্রা করে; এবং সে যদি চিহ্নিত উত্তরেরও উত্তরে বা দক্ষিণেরও দক্ষিণে, কোনও নূতন দ্বীপ বা সাগর প্রণালী, কোনও নূতন উত্তম আশাপথ আবিষ্কার করে,—তবে তাহার ইতিবৃত্ত ভূগোল-ইতিহাসে সর্ব্ববাদী সত্য হইয়া চিরকাল লিপিবদ্ধ থাকে; এবং সেই আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীর মাটি ও জলের অংশও যেন কিয়ৎ-পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। সেইরূপ আজ সেই শূন্যসাগরে ভাসিতে ভাসিতে যে দেশে আসিয়াছি, যে তত্ত্বভূমিতে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, তাহাকে কি জগৎ তাহার তত্ত্ব, তাহার জ্ঞান, বলিয়া গ্রহণ করিবে না? আমার জ্ঞান, আমার ভগবান, কি আজ জগতের জ্ঞান, জগতের ভগবান, হইবে না? আমার রহস্য কি জগতের রহস্য নয়? আজ আমি যেখানে আসিয়া থামিয়া গেলাম—এই জগৎও কি সেখানে আসিয়া থামিয়া গেল না? আমার বিরামে জগৎও কি বিশ্রাম লাভ করিল না?

আজ বুঝিলাম জীবনে অবকাশের মূল্য কি?—বসনে যেমন ছিদ্র টানা ও পড়েনের দরুন, কার্য্যে যেমন কারণ, সেইরূপ জীবনের গতিতে অবকাশ। সকল সৃষ্টির মূলেই এই অবকাশ, এই ফাঁকা রাজ্য। সকল ধাতু যেমন খনিতে, সকল তাপ যেমন বসুন্ধরার গর্ভে, সেইরূপ যত উৎপাদনী যত সৃজনী শক্তির মূল এইখানেই, এই ফাঁকে। শিল্পী এখান হইতেই রস সংগ্রহ করিয়া মাটিতে রসান দিয়া শিল্পমূর্ত্তি গঠন করে। এই যে স্বভাব-শোভা, এই যে রাশি-চক্র, এই যে বিশ্বের রাসমণ্ডল, ইহা সব ফাঁকারাজ্যের রসেই গঠিত। এই ফাঁকা হইতেই যত আঁকাজোকা। এই ফাঁকা হইতেই কায়ার সৃষ্টি, নীরূপ হইতেই রূপের বিভ্রম। যাহা ব্যক্ত তাহার স্বরূপ অব্যক্ত, যাহা নির্ব্বচনীয় তাহার মূলে একটি অনির্ব্ব-

চনীয়। যে ব্যক্ত হইতে অব্যক্তে, রূপ হইতে অরূপে না যায়, যাহার গতির পর অবকাশ না আসে, সে তত্ত্বের সন্ধান পায় না, রসের স্বাদ জানে না। পরব্যোমে যেমন অনাহত শব্দ আছে, তেমনি যাহা স্বপ্রকাশ তাহারও পশ্চাতে একটি শূন্য আছে। এই শূন্যটিই সৃষ্টি-স্থিতির সন্ধিস্থল। এই ফাঁকার ভিতর দিয়াই যত যাওয়া আসা, যত নিঃশেষ করা ও ভরিয়া তোলা, যত আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ, যত জোয়ার ভাঁটা, যত আলোক আঁধার। এই ফাঁকাটি না থাকিলে দুনিয়া ফাঁক হইত। এই ফাঁকার ভিতর দিয়াই আমি কেবলই যাওয়া আসা করিতেছি।

চল্ চল্ চল্, সাম্‌নে চল্।

শ্রীসরযূবালা দাসগুপ্তা।

অন্তর্যামী

[১]

এ পথেই যাব বঁধু? যাই তবে যাই!—
চরণে বিঁধুক কাঁটা তাতে ক্ষতি নাই!
যদি প্রাণে ব্যথা লাগে, চোখে আসে জল,
ফিরিয়া ফিরিয়া তোমা ডাকিব কেবল!
পথের তুলিব ফুল, কাঁটা ফেলি দিব,
মনে মনে সেই ফুলে তোমা সাজাইব!
গুন্ গুন্ গাহি গান পথে চলি যাব,
মনে মনে সেই গান তোমারে শুনাব!
দরশন নাহি দিলে কাছে কাছে থে'ক
যদি ভয় পাই বঁধু! মাঝে মাঝে ডে'ক!

[২]

ভরা প্রাণে আজ আমি যেতেছি চলিয়া
তোমারি দেখান এই বনপথ দিয়া!
কত না সোহাগভরে তুলিতেছি ফুল,
কত না গরবে মোর হৃদয় আকুল!
কত না বিচিত্ররাগে পরাণ কাঁপিছে,
কত না আশার আশে হৃদয় নাচিছে!
কে যেন কহিছে কথা, হৃদয়-মাঝারে
কে যেন আঁকিছে আলো নিশীথ আঁধারে!
কে যেন কি জানি মোরে করায়েছে পান
বাতাসে পত্রের মত মর্ম্মরে পরাণ!

যেন কার তালে তালে ফেলিছি চরণ
যেন কার গানে গানে ভরেছি জীবন!
তোমারি মোহিনী এ যে তোমারি মোহিনী
ভাবে ভোর তাই বঁধু বুঝিতে পারিনি।

[৩]

কেমন্ করে লুকিয়ে থাক এত কাছে মোর
বুকের মাঝে কেমন্ করে চোখে বহে লোর!
দিবস্‌নিশি কতই তব কথা শুনি কাণে
প্রাণের মাঝে তোলাপাড়া মানে অভিমানে!
পরশ্ তব স্বপন্‌সম প্রাণে আনে ঘোর
নিশাস্ তব মুখে লাগে কাঁপে প্রাণ মোর!
তোমার প্রেমে এত জ্বালা আগে নাহি জানি
চোখের জলে ভেসে ভেসে আজি হার মানি!
ছেড়ে দাও'ত চলে যাই, তুমি থাক পিছে,
দরশ্ যদি নাহি দিলে সোহাগ্ করা মিছে!

[৪]

ক্ষম অভিমান, বঁধু, ক্ষম অভিমান
আঁধারে তোমার লাগি ঝরিছে নয়ান!
বাহু বাড়াইয়া দিলে কিছু নাহি পাই
শূন্য মনে ভূমিতলে কাঁদিয়া লুটাই!
বুঝি এই প্রেমে লাগে অনেক সাধনা!—
তবে ছেড়ে দিনু আজ! কর গো রচনা
আমার জীবন লয়ে যাহা তুমি চাও!
পরাণের তারে তারে আপনি বাজাও!
কাঁদিব না আমি আর কথা নাহি কব
নয়ন মুদিয়া শুধু পথে পড়ে রব!

[৫]

কাঁদিব না মুখে বলি, আঁখি নাহি মানে
পরাণে কেমন করে পরাণ্ই তা জানে!
রাগ করিও না বঁধু আঁখি যদি ঝরে,
তুমি জান সেই অশ্রু তোমারই তরে!
এত করে চাপি বুক তবু হাহাকার
ছিঁড়িয়া হৃদয় মোর উঠে বার বার!
সে শুধু তোমারি তরে তোমা পানে ধায়
তোমারে না পেয়ে, মোর বুকে গরজায়!
এই অশ্রু, এই ব্যথা, এই হাহাকার,
তুমি না লইবে যদি কারে দিব আর?

[৬]

মরম আঁধারে বঁধু প্রদীপ জ্বালাও!
আমার সকল তারে বাজাও, বাজাও,
আপনি বাজাও! আমি কথা নাহি কব,
নয়ন মুদিয়া আমি শুধু চেয়ে রব!

[৭]

কোন্ ছায়ালোক হ'তে প্রাণের আড়ালে
এমন সোহাগভরে প্রদীপ জ্বালালে!
ওগো ছায়ারূপী! কোন্ ছায়ালোকে তুমি
তুলিতেছ গীতধ্বনি হৃদি-তন্ত্রী চুমি
মোহন পরশে? আমি কথা নাহি কই
বঁধু হে! নয়ন মুদি শুধু চেয়ে রই!

[৮]

কোথা ওই ছায়ালোক, কোথা প্রাণখানি!
এই প্রাণ-প্রান্ত হ'তে কতদূর জানি!
কতদূর, কত কাছে, ভেবে নাহি পাই
আঁধারের মাঝে শুধু আঁখি মুদে চাই!
একি মোর মরমের অজানিত দেশ?
এই প্রাণ-প্রান্ত কিগো পরাণের শেষ?
একি গো তোমার বঁধু গোপন আবাস?
হোথা হ'তে মাঝে মাঝে দিতেছ আভাস?
আমি'ত জানিনা কিছু তুমি সব জান,—
কোথা হ'তে এত করে মোরে তুমি টান!

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম

২। নির্ব্বাণ।

বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ব্বাণ বুঝিতে গেলে অনেকগুলি কথা বুঝিতে হয়; এবং সেই সকল কথা বুঝিয়া উঠাও অতি কঠিন। মোটা-মুটি ধরিতে গেলে নির্ব্বাণ শব্দে নিবিয়া যাওয়া বুঝায়। প্রদীপ যেমন নিবিয়া যায়, তেমনই মানুষ নিবিয়া গেল। প্রদীপ নিবিয়া গেলে কিছু থাকেনা; মানুষ নিবিয়া গেলেও কিছুই থাকে না। এ কথাটা, শুনিতে যত সোজা, ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে তত সোজা নয়। প্রদীপ নিবিয়া গেল, আর কিছু নাই, একেবারে শেষ হইয়া গেল; কিন্তু মানুষ নিবিয়া গেলে কি সেইরূপ একেবারে শেষ হইয়া যায়? একেবারে 'নিহিল' হইয়া যায়? একেবারে 'এনিহিলেসন' হইয়া যায়? একেবারে 'নাস্তি' হইয়া যায়? এই-খানেই গোল বাধিল। আমি একেবারে থাকিব না, এবং সেইটিই আমার জীবনের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হইবে? আমি তপ জপ, ধ্যান ধারণা করিব, শুদ্ধ আমার অস্তিত্বটি বিলোপ করিবার জন্য? এ ত বড় শক্ত কথা।

অনেকে মনে করেন, বুদ্ধ এইরূপ আত্মার বিনাশই নির্ব্বাণ শব্দের অর্থ করিয়াছিলেন। এইজন্য অনেক পাদরী সাহেবেরা বলেন বৌদ্ধেরা নিহিলবাদী বা বিনাশবাদী। বুদ্ধ নিজে কি বলি-য়াছিলেন, তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই। তাঁহার নির্ব্বাণের পাঁচ শত বৎসর পরে লোকে তাঁহার বক্তৃতার যেরূপ রিপোর্ট দিয়াছে, তাহাই আমরা দেখিতে পাই। তাহাও, আবার তিনি ঠিক যে ভাষায় বলিয়াছিলেন, সে ভাষার ত কিছুই পাওয়া যায় না। পালি ভাষায় তাহার যে রিপোর্ট তৈয়ারি হইয়াছিল, সেই

রিপোর্টমাত্র পাওয়া যায়। তাহাতেও ঐরূপ প্রদীপ নিবিয়া যাওয়ার সহিতই নির্ব্বাণের তুলনা করে। কিন্তু লোকে বুদ্ধদেবকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে নির্ব্বাণের পর কি থাকে। সুতরাং নির্ব্বাণে যে একেবারে সব শেষ হইয়া যায়, তাঁহার শিষ্যেরা সেটা ভাবিতেও যেন ভয় পাইত। বুদ্ধদেব সে কথার কি জবাব দিলেন, আমরা পরে তাহা বিবেচনা করিব।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর অন্ততঃ পাঁচ ছয় শত বৎসরের পর, কনিষ্ক রাজার গুরু অশ্বঘোষ সাধারণ লোকের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য একখানি কাব্য রচনা করেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, যেমন তিক্ত ঔষধ খাওয়াইবার জন্য কবিরাজেরা মধু দিয়া মাড়িয়া খাওয়ায়, সেইরূপ আমি এই কঠিন বৌদ্ধধর্ম্মের মতগুলি কাব্যের আকারে লিখিয়া লোকের মধ্যে প্রচার করিতেছি। তিনি নির্ব্বাণ সম্বন্ধে যাহা বলেন, সেটা বুদ্ধের কথার রিপোর্ট নহে, তাঁহার নিজেরই কথা। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের একজন প্রধান প্রচারক, প্রধান গুরু এবং প্রধান কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার কথা আমাদের মন দিয়া শুনা উচিত। তিনি বলিয়াছেন :—

> দীপো যথা নির্বৃতিমভ্যুপেতো
> নৈবাবনিং গচ্ছতি নান্তরিক্ষম্।
> দিশং ন কাঞ্চিৎ বিদিশং ন কাঞ্চিৎ
> স্নেহক্ষয়াৎ কেবলমেতি শান্তিম্॥
> এবং কৃতী নির্বৃতিমভ্যুপেতো
> নৈবাবনিং গচ্ছতি নান্তরিক্ষম্।
> দিশং ন কাঞ্চিদ্বিদিশং ন কাঞ্চিৎ
> ক্লেশক্ষয়াৎ কেবলমেতি শান্তিম্॥

"প্রদীপ যেমন নির্ব্বাণ হওয়ার পর পৃথিবীতে যায় না, আকাশেও যায় না, কোন দিগ্‌বিদিকেও যায় না; তৈলেরও শেষ, প্রদীপটারও শেষ; সাধকও তেমনই ভাবে, নির্ব্বাণ হওয়ার পর, পৃথিবীতেও যান

না, আকাশেও যান না, কোন দিগ্‌বিদিকেও যান না। তাঁহার সকল ক্লেশ ফুরাইয়া গেল। তাঁহারও সব ফুরাইয়া গেল, সব শান্ত হইল।”

এখানে কথা হইতেছে “উপৈতি শান্তিম্‌”—‘সব শেষ হইয়া গেল’ —ইহার অর্থ কি নিহিল? ইহার অর্থ কি আত্মার বিনাশ? অস্তিত্বের লোপ? অশ্বঘোষও নির্ব্বাণের পর আর কিছু থাকিল কি না, কিছুই বলিলেন না। এই দুইটি কবিতার পরই তিনি অন্য কথা পাড়িলেন। কিন্তু এই কবিতা দুইটির পূর্ব্বে যে তিনটি কবিতা আছে, তাহা পড়িলে, নির্ব্বাণ যে অস্তিত্বের লোপ, এরূপ বোধ হয় না। সে তিনটি কবিতা এই,—

তজ্জন্মনো নৈকবিধস্য সৌম্য
তৃষ্ণাদয়ো হেতব ইত্যবেত্য।
তাংশ্ছিন্ধি দুঃখাদ্‌যদি নির্ম্মুমুক্ষা
কার্য্যক্ষয়ঃ কারণসংক্ষয়াদ্ধি॥
দুঃখক্ষয়ো হেতু-পরিক্ষয়াচ্চ
শান্তং শিবং সাক্ষিকুরুষ ধর্ম্মম্।
তৃষ্ণাবিরাগং লয়নং নিরোধং
সনাতনং ত্রাণমহার্য্যমার্য্যম্॥
যস্মিন্নজাতির্ন জরা ন মৃত্যুঃ
ন ব্যাধয়ো নাপ্রিয়সম্প্রযোগঃ।
নেচ্ছাবিপন্ন প্রিয়বিপ্রযোগঃ
ক্ষমং পদং নৈষ্ঠিকমচ্যুতং তৎ॥

“অতএব তৃষ্ণা প্রভৃতিই নানাবিধ জন্মের হেতু এইটি মনে মনে বুঝিয়া, তোমার যদি মুক্ত হইবার ইচ্ছা থাকে, তবে সেই তৃষ্ণাকে ছেদন কর। যেহেতু, কারণের ক্ষয় হইলে, কার্য্যেরও ক্ষয় হইবে।

“এখানে তৃষ্ণাদি হেতুর ক্ষয় হইলে, তোমার দুঃখেরও ক্ষয় হইবে। অতএব তুমি “ধর্ম্ম”কে প্রত্যক্ষ কর। এ “ধর্ম্ম” শান্তিময়, মঙ্গলময়,

ইহাতে তৃষ্ণার উপর বিরাগ হয়, ইহা গুহার মত, ইহাতে সর্ব্বধর্ম্মের নিরোধ হয়, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম, ইহাতেই পরিত্রাণ, ইহা কেহ হরণ করিতে পারে না, ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

"ইহাই চরম ও অচ্যুত পদ। ইহাতে জন্ম নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, ব্যাধি নাই, শত্রুসমাগম নাই, নৈরাশ্য নাই, প্রিয়-বিরহ নাই, ইহাই পাইবার মতন জিনিস।"

যখন অশ্বঘোষ এই তিনটি কবিতার পর নির্ব্বাণের ঐ দুইটি কবিতা লিখিয়াছেন, তখন তিনি নির্ব্বাণশব্দে অস্তিত্বের লোপ বুঝেন নাই। তিনি বুঝিয়াছেন যে, নির্ব্বাণের পর আর কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইবে না, অথচ অস্তিত্বেরও লোপ হইবে না।

পালি ভাষার পুস্তকে বুদ্ধদেবকে নির্ব্বাণের পর কি থাকিবে এই কথা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি কি উত্তর দিয়াছেন দেখা যাক্। "নির্ব্বাণের পর কিছু থাকিবে কি?" বুদ্ধদেব বলিলেন "না"। "থাকিবে না কি?" উত্তর হইল "না"। "থাকা না থাকার মাঝামাঝি কোন অবস্থা হইবে কি?" বুদ্ধদেব বলিলেন "না"। "কিছু থাকা না থাকা এদু'য়েরই বাহিরে কোন বিশেষ অবস্থা হইবে কি?" আবার উত্তর হইল "না"।

তবে দাঁড়াইল কি? এমন একটা অবস্থা দাঁড়াইল, যে অবস্থায় "অস্তি"ও বলিতে পারিনা, "নাস্তি"ও বলিতে পারিনা। এদু'য়ে জড়াইয়া কোন অবস্থা নয়, এদু'য়ের অতিরিক্ত কোন অবস্থাও নয়। ইহাতে পাওয়া গেল কোন অনির্ব্বচনীয় অবস্থা, যাহা কথায় প্রকাশ করা যায় না, মানুষের জ্ঞানের বাহিরে।

এই অবস্থাকেই মহাযানে "শূন্য" বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকে। "শূন্য" বলিতে কিছুই নয় বুঝায়, অর্থাৎ অস্তিত্ব নাই এই কথাই বুঝায়। কিন্তু বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা বলেন "আমরা করি কি? আমরা যে ভাষায় শব্দ পাই না। নির্ব্বাণের পর যে অবস্থা হয়, তাহা যে বাক্যের অতীত। ঠিক্ কথাটি পাইনা বলিয়াই আমরা উহাকে

"শূন্য" বলি। কিন্তু শূন্যশব্দে আমরা ফাঁকা বুঝাই না, আমরা এমন অবস্থা বুঝাইতে চাই যাহা অস্তিনাস্তি প্রভৃতি চারি প্রকার অবস্থার অতীত। 'অস্তিনাস্তিতদুভয়ানুভয়চতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্তং শূন্যম্'।

শঙ্করাচার্য্য তাঁহার তর্কপাদে শূন্যবাদীদের নানারকমে ঠাট্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "যাহাদের মতে সবই শূন্য, তাহাদের সঙ্গে আর বিচার কি করিব?" তিনি বৌদ্ধদের "বিনাশবাদী" বলেন। তাঁহার মতে নৈয়ায়িকেরা "অর্দ্ধবিনশন" অর্থাৎ আধখানা বিনাশবাদী। কেননা, নৈয়ায়িকেরাও বলেন, "অত্যন্ত সুখদুঃখ-নিবৃত্তি"র নামই "অপবর্গ। সুখদুঃখ যদি একেবারেই না রহিল, তবে আত্মা ত পাথর হইয়া গেল। তাই শঙ্করের পর মহাকবি শ্রীহর্ষ গৌতম ঋষিকে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন

মুক্তয়ে যঃ শিলাত্বায় শাস্ত্রমূচে সচেতসাম্।
গোতমং তমবেত্যৈব যথা বিথ তথৈব সঃ॥

অর্থাৎ যে গোতম জীবন্ত প্রাণীকে পাথর করিয়া দিবার জন্য শাস্ত্র লিখিয়াছেন, তাঁহার নামটী সার্থক হইয়াছে, তিনি গোতমই বটেন—তাঁহার মত গরু আর দ্বিতীয় নাই।

সাধারণ লোকে বলিবে পাথর হওয়াও বরং ভাল। কেননা, কিছু আছে দেখিতে পাইব। শূন্য হইলে ত কিছুই থাকিবে না।

যাহাহোক অশ্বঘোষ যে নির্ব্বাণের অর্থ করিয়াছেন, বুদ্ধদেব পালি ভাষার পুস্তকে উহার যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে নির্ব্বাণ একটি অনির্ব্বচনীয় অবস্থা। শুধু বাক্যের অতীত নয়, মানুষের ধারণারও অতীত। এইরূপ অবস্থাকেই কি কাণ্ট ট্রান্সেণ্ডেণ্টাল বলিয়া গিয়াছেন? কেননা, ইহা মানুষের বুদ্ধি ছাড়াইয়া যায়, মানুষে ইহা ধারণা করিতে পারে না।

এরূপ অনির্ব্বচনীয় না বলিয়া, অশ্বঘোষের মতে যে চরম ও অচ্যুতপদ আছে, তাহাকে অস্তি বলিয়া স্বীকার করনা কেন?

কিন্তু অস্তি বলিলে, একটা বিষম দোষ হয়। যতক্ষণ আত্মা থাকিবে, ততক্ষণ "অহং" এই বুদ্ধিটি থাকিবে। অহংজ্ঞান থাকিলেই অহঙ্কার হইল। অহঙ্কার থাকিলেই সকল অনর্থের যা মূল, তাই রহিয়া গেল। সুতরাং সে যে আবার জন্মিবে, তাহার সম্ভাবনা রহিয়া গেল। আরও কথা, আত্মা যখন রহিলই, তখন তাহার ত গুণগুলাও রহিল। অগ্নি কিছু রূপ ও উষ্ণতা ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। আত্মা থাকিলে তাহার একত্ব-সংখ্যা থাকিবে। একত্ব-সংখ্যাও ত একটি গুণ। সে আত্মার জ্ঞান থাকিবে? না, থাকিবেনা? যদি জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে জ্ঞেয় পদার্থও থাকিবে, জ্ঞেয় পদার্থ থাকিলেও আত্মার মুক্তি হইল না। আর, আত্মার যদি জ্ঞান না থাকে, তবে সে আত্মা আত্মাই নয়। সেইজন্যই অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে বুদ্ধদেব বলিতেছেন, "আত্মার যতক্ষণ অস্তিত্ব স্বীকার করিবে, ততক্ষণ উহার কিছুতেই মুক্তি হইবে না"। তাঁহার প্রথম গুরু অরাড় কালামের সহিত বিচার করিয়া যখন তিনি দেখিলেন যে ইহারা বলে আত্মা দেহনির্ম্মুক্ত অর্থাৎ লিঙ্গ-দেহ-নির্ম্মুক্ত হইলেই, মুক্ত হয়, তখন সে মুক্তি তাঁহার পছন্দ হইল না। তিনি আত্মার অস্তিত্ব নষ্ট করিয়া আত্মাকে "চতুষ্কোটি-বিনির্ম্মুক্ত" করিয়া, তবে তৃপ্ত হইলেন।

তাঁহার শিষ্যেরা, আত্মাকে শূন্যরূপ, অনির্ব্বচনীয়রূপ, চতুষ্কোটি-বিনির্ম্মুক্তরূপ, মনে করিলেও ক্রমে তাঁহাদের শিষ্যেরা আবার নির্ব্বাণকে অভাব বলিয়া মনে করিত। তাহাদের মতে সংসার হইল ভাব পদার্থ এবং নির্ব্বাণ অভাব। ভাবাভাব বলিতে তাহারা ভব ও নির্ব্বাণ বুঝিতেন। তাহারও পরে আবার যখন তাহারা দেখিল, যে প্রকৃত পক্ষে ভব বা সংসার সেও বাস্তবিক নাই, আমরা ব্যবহারতঃ তাহাদিগকে "অস্তি" বলিয়া মনে করিলেও বাস্তবিক সেটি অভাব পদার্থ, তখন তাহাদের ধর্ম্ম অতি সহজ হইয়া আসিল। তখন তাহারা বলিল—

অপণে রচিরচি ভব নির্ব্বাণা।
মিছা লোক বন্ধাবএ অপণা ॥

অর্থাৎ ভবও শূন্যরূপ, নির্ব্বাণও শূন্যরূপ। ভব ও নির্ব্বাণে কিছুই ভেদ নাই। মানুষে আপন মনে ভব রচনা করে, নির্ব্বাণও রচনা করে। এইরূপে তাহারা আপনাদের বন্ধ করে। কিন্তু পরমার্থতঃ দেখিতে গেলে কিছুই কিছু নয়। সবই শূন্যময়।

তাহা হইলে ত বেশ হইল। ভবও শূন্য, ভাবও শূন্য, আত্মাও শূন্য, সুতরাং আত্মা সর্ব্বদাই মুক্ত, স্বভাবতঃই মুক্ত, "শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ"। তবে আর ধর্ম্মেই কাজ কি? যোগেই কাজ কি? কঠোরেই বা কাজ কি? ধ্যানেই বা কাজ কি? সমাধিতেই বা কাজ কি? ধর্ম্ম অধর্ম্মেই বা কাজ কি? যার যা খুসি কর! তোমরা স্বভাবতঃই মুক্ত, কিছুতেই তোমাদিগকে বন্ধ করিতে পারিবে না। পরম যোগীও যেমন মুক্ত, অতিপাপিষ্ঠও তেমনই মুক্ত।

এই জায়গায় সহজিয়া বৌদ্ধ বলিল যে মূঢ় লোক ও পণ্ডিত লোকের মধ্যে একটি ভেদ আছে। সকলেই স্বভাবতঃ মুক্ত বটে, কিন্তু মূঢ় লোকে পঞ্চকামোপভোগাদি দ্বারা আপনাদের বন্ধ করিয়া ফেলে, পণ্ডিতেরা গুরুর উপদেশ পাইয়া, তাহার পর পঞ্চকামোপভোগ করিলে, কিছুতেই বন্ধ হয় না।

"যেনৈব বধ্যতে বালো বুধস্তেনৈব মুচ্যতে"। যে পঞ্চকামোপভোগাদি দ্বারা বালজাতীয় অর্থাৎ মূর্খ লোকে বন্ধ হয়, পণ্ডিতেরা গুরুর উপদেশ পাইয়া তাহাতেই মুক্ত হয়।

আর এক উপায়ে নির্ব্বাণ ব্যাখ্যা করা যায়। মানুষের চিত্ত যখন বোধিলাভের জন্য অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তখন তাহাকে বোধিচিত্ত বলে। বোধিচিত্ত ক্রমে সৎপথে বা ধর্ম্মপথে বা সদ্ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে যেমন তাহার পুনঃ পুনঃ জন্ম হইতে লাগিল, তেমনই সে উচ্চ হইতে অধিক উচ্চ উচ্চ লোকে উঠিতে লাগিল। যদি তাহার

উদ্যম অত্যন্ত উৎকট হইয়া উঠে, তবে সে এই জন্মেই অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারে। কাহারও কাহারও মতে সে এই জন্মেই বোধি লাভ করিতে পারে। বৌদ্ধদের বিহারে যে সকল স্তূপ দেখা যায়, সেই স্তূপগুলিতে এই উন্নতির পথ মানুষের চোখের উপর ধরিয়া দিয়াছে। স্তূপগুলি প্রথমে একটি গোল নলের উপর খানিক দূর উঠিয়াছে। তাহার উপর একটি গোলের অর্দ্ধেক। তাহার উপর একটি নিরেট চারকোণা জিনিস। তাহার উপর একটি ছাতা। তাহার উপর আর একটি ছাতা, এটি প্রথম ছাতা হইতে একটু বড়। তাহার উপর আর একটি ছাতা, দ্বিতীয় ছাতার চেয়ে আর একটু বড়। চতুর্থটি তৃতীয় ছাতার অপেক্ষা একটু ছোট, পঞ্চমটি আরও ছোট। এইখানে এক সেট ছাতা শেষ হইয়া গেল। তাহারও উপর ছাতার খানিকটা বাঁট মাত্র। এই বাঁটের পর আবার আর এক সেট ছাতা, কোন মতে ১৩টি, কোন মতে ১৬টি, কোন মতে ২১টি, কোন মতে ২৩টিও দেখা যায়। ছাতাগুলি ক্রমে ছোট হইয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর আবার খানিকটা ছাতার বাঁট। ইহার উপর আবার মোচার আগার মত আর একটা জিনিস। মোচার আগাটি বেড়িয়া উপরি উপরি চার পাঁচটি বৃত্ত আছে। মোচার আগাটি একেবারে ছুঁচের মত।

বোধিচিত্ত প্রণিধিবলে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই তিনি এই স্তূপে উঠিতে লাগিলেন। স্তূপের নীচের দিক্‌টা ভূত-প্রেত-পিশাচ-লোক ও নরক। তাহার উপর যে গোলের আধখানা আছে, সেটি মনুষ্যলোক। বোধিচিত্ত মানুষেরই হয়। সুতরাং সে চিত্ত এইখান হইতেই উঠিতে থাকে। প্রথমে দান, শীল, সমাধি ইত্যাদি দ্বারা সে ঐ নীরেট চারিকোণায় উঠিল। এটি চারিজন মহারাজার স্থান, তাঁহারা চারিদিকের অধিপতি। তাঁহাদের নাম ধৃতরাষ্ট্র, বিরূঢ়ক, বৈশ্রবণ ও বিরূপাক্ষ। তাহার উপর ত্রয়স্ত্রিংশ ভুবন। এখানকার রাজা ইন্দ্র এবং ৩৩ জন দেবতা

এখানে বসবাস করেন। ইহার উপর তুষিত ভুবন। বোধিসত্ত্বেরা এইখান হইতে একবারমাত্র পৃথিবীতে গমন করেন এবং সেখানে গিয়া সম্যক্ সংবোধি লাভ করিয়া বুদ্ধ হন। ইহার পর যামলোক। ইহার পর নির্ম্মাণরতিলোক, অর্থাৎ, ইঁহারা ইচ্ছামত নানারূপে নানা ভোগ্যবস্তু নির্ম্মাণ করিয়া উপভোগ করিতে পারেন। ইঁহা-দের পরে যে লোক, তাহার নাম পরনির্ম্মিতবশবর্ত্তী, অর্থাৎ, তাঁহারা নিজে কিছুই নির্ম্মাণ করেন না, পরে নির্ম্মাণ করিয়া দিলে, তাঁহারা উপভোগ করিতে পারেন। এই পর্য্যন্ত আসিয়া কামধাতু শেষ হইয়া গেল, অর্থাৎ, এইখানে আসিয়া বোধিচিত্তের আর কোন ভোগের আকাঙ্ক্ষা রহিল না।

এইখান হইতে রূপলোকের আরম্ভ। কাম নাই, রূপ আছে, আর আছে উৎসাহ। সে উৎসাহে ধ্যান, প্রণিধি ও সমাধিবলে বোধিচিত্ত ক্রমশঃই উঠিতে লাগিলেন। রূপধাতুতে, প্রধানতঃ, চারিটি লোক; অবশিষ্ট লোকগুলি এই চারিটিরই অধীন। এই চারিটি লোক লাভ করিতে হইলে, বৌদ্ধদের চারিটি ধ্যান অভ্যাস করিতে হয়। প্রথম ধ্যানে বিতর্ক ও বিবেক থাকে। দ্বিতীয় ধ্যানে বিত-র্কের লোপ হইয়া যায়, প্রীতি ও সুখে মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। তৃতীয় ধ্যানে প্রীতি লোপ হইয়া যায়, কেবল মাত্র সুখ থাকে। চতুর্থ ধ্যানে সুখও লোপ হইয়া যায়, তখন বোধিচিত্ত রূপ অর্থাৎ শরীরের সম্পর্ক ত্যাগ করিতে চান।

রূপ ও শরীরের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া বোধিচিত্ত আরও অগ্রসর হইতে থাকেন। এবার তিনি রূপলোক ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন। রূপলোক ছাড়াইয়া অরূপলোকে উঠিয়াছেন। তখন তিনি আপ-নাকে, সমস্ত বস্তু, এমন কি নীরেট জিনিসটি পর্য্যন্ত তিনি আকাশ মাত্র দেখেন, অর্থাৎ সকলই তাহার নিকট অনন্ত ও উন্মুক্ত বলিয়া বোধ হয়। তাহার পর আত্মচিন্তা করিতে করিতে তাঁহার সম্পূর্ণ ধারণা হয় যে কিছুই কিছু নয়। এই যে অনন্ত দেখিতেছি, ইহা

কিছুই নয়। ইহারও উপর বোধিসত্ব অগ্রসর হইলে তখন তাহার চিন্তা হইল এই যে কিছুই নয়, ইহার কোন সংজ্ঞা আছে কিনা। যদি সংজ্ঞা থাকে তবে সংজ্ঞীও আছে। কিন্তু সংজ্ঞী ত নাই, সে ত অকিঞ্চন। সুতরাং সংজ্ঞাও নাই, সংজ্ঞীও নাই। ইহার পর বোধিচিত্ত সেই মোচার আগায় উঠিলেন। এই যে স্তূপ ইহাই "ত্রৈধাতুক লোক" তিনি এখন ইহার মাথার উপর। তাঁহার চারিদিকে অনন্তশূন্য, আর তাঁহার উঠিবার জায়গা নাই। তিনি সেইখান হইতে অনন্তশূন্যে ঝাঁপ দিলেন। যেমন নুণের কণা জলে মিশিয়া যায়, তাহার কিছুই থাকে না। সেইরূপ বোধিচিত্তও আপনাকে হারাইয়া অনন্তশূন্যে মিশিয়া গেলেন। যেমন সমুদ্রের জলে একটু লোনা আস্বাদ রহিয়া গেল, তেমনি অনন্তশূন্যে বুদ্ধের একটু প্রভাব রহিয়া গেল। তাঁহার প্রণীত ধর্ম্ম ও বিনয় অনন্তকালের জন্য ত্রৈধাতুক-লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল।

নির্ব্বাণ বলিতে 'নাই' 'নাই'ই বুঝায়। প্রথম প্রথম বৌদ্ধেরা এই 'নাই' 'নাই' লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিত। নির্ব্বাণ হইয়া গেল, একটা অনির্ব্বচনীয় অবস্থা উদয় হইল। ইহাতেই প্রথম প্রথম বৌদ্ধেরা সন্তুষ্ট থাকিত। কিন্তু পরে অনেকে ইহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা কেবল শূন্য হওয়াই চরম উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। তাঁহারা উহার সঙ্গে আর একটা জিনিস আনিয়া ফেলিলেন; উহার নাম 'করুণা'। ইহা যেমন তেমন করুণা নয়, সর্ব্বজীবে করুণা, সর্ব্বভূতে করুণা। রূপধাতু ত্যাগ করিয়া অরূপ-ধাতুতে আসিয়া যেমন সকল পদার্থকেই আকাশের ন্যায় অনন্ত দেখিয়াছিলেন, এখন সেইরূপ করুণাকেও অনন্ত দেখিতে লাগিলেন। শুষ্ক 'শূন্যতা' লইয়া যে নির্ব্বাণ, প্রাণশূন্য, নিশ্চল, নিস্পন্দ, কতকটা পাথরের মত, কতকটা শুকনা কাঠের মত হইয়াছিল; করুণার স্পর্শে, তাহাতে যেন জীবন সঞ্চার হইল; নির্জ্জীবে জীবন আসিল, উদ্দেশ্যশূন্যে উদ্দেশ্য আসিল, সত্য সত্যই শুষ্কতরু যেন মুঞ্জরিয়া

উঠিল। যাঁহারা অর্হৎ হওয়াই, অর্থাৎ কোনরূপে আপনাদের মুক্ত করাই, জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়াছিলেন, সমস্ত জগৎ যাঁহাদের চক্ষে থাকিলেও হইত, না থাকিলেও হইত। জগতের পক্ষে যাঁহারা সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, সেই বৌদ্ধরা এখন হইতে আপনার উদ্ধারটা আর তত বড় বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না, জগৎ উদ্ধার তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য হইল। আমার আমিত্বটুকু লোপ করিব, আমি মুক্ত হইব, আর আমার চারিদিকে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্তকোটি জীব বদ্ধ থাকিবে, একি আমার সহ্য হয়। বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর সংসারের সকল গণ্ডী পার হইয়া ধ্যান-ধারণাদি বোধিসত্ত্বের যা কিছু কাজ, সব সাঙ্গ করিয়া, এমন কি ধর্ম্মস্তূপের আগায় উঠিয়া শূন্যতা ও করুণাসাগরে ঝাঁপ দিতে যান, এমন সময় তিনি চারিদিকে কোলাহল শুনিতে পাইলেন। তখন তাঁহার আমিত্ব চলিয়া গিয়াছে, তাঁহার আয়তন আকাশের মত অনন্ত হইয়াছে, তাঁহার করুণাও আকাশের মত অনন্ত হইয়াছে। তিনি দেখিলেন ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীব দুঃখে আর্ত্তনাদ করিতেছে; জিজ্ঞাসা করিলেন 'কিসের কোলাহল'। তাহারা উত্তর করিল 'আপনি করুণার অবতার আপনি যদি নির্ব্বাণ লাভ করেন, তবে আমাদের কে উদ্ধার করিবে?' তখন অবলোকিতেশ্বর প্রতিজ্ঞা করিলেন 'যতক্ষণ জগতের একটিমাত্র প্রাণী বদ্ধ থাকিবে, ততক্ষণ আমি নির্ব্বাণ লইব না।'

খ্রীষ্টের দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতে বৌদ্ধেরা ভারতবর্ষে এই মত লইয়াই চলিত। ইহাকেই তখনকার লোকে মহাযান বলিত। তাহারা মনে করিত এত বড় মত আর হইতে পারে না। যখন বোধিসত্ত্বেরা করুণায় অভিভূত হইয়া পড়িতেন, তখন তাঁহারা জীবের উদ্ধারের জন্য পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। বুদ্ধদেব যে পঞ্চশীল দিয়া গিয়াছেন, তাহা ভঙ্গিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। আর্য্যদেব 'চিত্তবিশুদ্ধিপ্রকরণে' বলিয়া গিয়াছেন 'যে জগৎ উদ্ধারের জন্য কোমর বাঁধিয়াছে, তাহার যদি কোন দোষ হয়, সে দোষ একেবারে ধর্ত্তব্যই নয়।'

এই বৌদ্ধধর্ম্মের চরম উন্নতি। মহাযানের দর্শন যেমন গভীর, ধর্ম্মমত যেমন বিশুদ্ধ, করুণা যেমন প্রবল, এমন আর কোন ধর্ম্মে দেখা যায় না। বুদ্ধদেবের সময় হইতে প্রায় হাজার বৎসর অনেক লোকে অনেক তপস্যা ও সাধনা করিয়া এইমতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে তখন বড় বড় রাজ্য ছিল, নানারূপ ধনাগমের পথ ছিল, কৃষি-বাণিজ্য ও শিল্পের যথেষ্ট বিস্তার হইতেছিল, বিদ্যার যথেষ্ট আদর ছিল, ধর্ম্মেরও যথেষ্ট আদর ছিল। তাই এত লোকে এতশত বৎসর ধরিয়া একই বিষয়ে চিন্তা করিয়া এতদূর উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন।

চাণক্য শ্লোকে বলে 'ধন উপায় করা বড় সহজ, কিন্তু ধন রাখা বড় কঠিন।' জ্ঞানেরও তাই, জ্ঞান উপার্জ্জন সহজ, কিন্তু জ্ঞানটি রক্ষা করা বড় কঠিন। মহাযানেরও এই জ্ঞান বেশীদিন রক্ষা হয় নাই। দেশ ক্রমে ছোট ছোট রাজ্যে ভাগ হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য লোপ হইয়া আসিল, লোকেও দেখিল যে বহুকাল চিন্তা করিয়া বহুকাল যোগসাধনা করিয়া মহাযান হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব, সুতরাং একটা সহজ মত বাহির করিতে হইবে। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা রাজার দত্ত বৃত্তিতে বঞ্চিত হইয়া যজমানদিগের উপর নির্ভর করিতে লাগিলেন; তাঁহাদের আর চিন্তা করিবার সময়ও রহিল না, সে স্বাধীনতাও রহিল না।

কিন্তু নির্ব্বাণের কথা বলিতে গিয়া আমরা অনেক বাহিরের কথা বলিয়া ফেলিলাম। বোধ হয় এগুলি না বলিলে হইত না। মহাযানের নির্ব্বাণ 'শূন্যতা' ও 'করুণায়' মিশামিশি। এ নির্ব্বাণের একদিকে 'করুণা', আর একদিকে 'শূন্যতা', করুণা সকলেই বুঝিতে পারে। কিন্তু যে সকল যজমানের উপর বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বেশী নির্ভর করিতে লাগিলেন, তাহাদিগকে শূন্যতা বুঝান বড়ই কঠিন। তাঁহারা শূন্যতার বদলে আর একটি শব্দ ব্যবহার করিতেন—সেটি "নিরাত্মা"। নিরাত্মা শব্দটি সংস্কৃত ব্যাকরণে ঠিক সাধা যায় না, কিন্তু

এসময় বৌদ্ধেরা সংস্কৃত ব্যাকরণের গণ্ডীর মধ্যে থাকিতে চাহিতেন না। তাঁহারা যজমানদিগকে বুঝাইলেন যে, বোধিসত্ত্ব যখন স্তূপের মাথায় দাঁড়াইয়া আছেন, তখন তাঁহারা চারিদিকে অনন্ত শূন্য দেখিতেছেন। এই শূন্যকে তাঁহারা বলিলেন 'নিরাত্মা', শুধু নিরাত্মা বলিয়া তৃপ্ত হইলেন না, বলিলেন "নিরাত্মাদেবী", অর্থাৎ নিরাত্মা শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। বোধিসত্ত্ব নিরাত্মাদেবীর কোলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। পুরুষ মেয়ের কোলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলে যাহা হয়, যজমানেরা সে কথা অনায়াসেই বুঝিতে পারিল; কেননা সেটা বুঝিতে ত কাহাকেও বিশেষ প্রয়াস করিতে হয় না। এখন নির্ব্বাণের অর্থ কি দাঁড়াইল, তাহা আর প্রকাশ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। আর ঠিক ঐ সময়েই, যজমানেরা বেশ বুঝিল, মানুষের মন কত নরম হয়, কত করুণায় অভিভূত হয়। সে কথাও তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইল না। সুতরাং নির্ব্বাণ যে শূন্যতা ও করুণার মিশামিশি, তাহাই রহিয়া গেল, অথচ বুঝিতে কত সহজ হইল। এ নির্ব্বাণেও সেই অনির্ব্বচনীয় ভাব ও সেই অনন্ত ভাব, দিকেও অনন্ত, দেশেও অনন্ত, কালেও অনন্ত।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

ভাষার কথা

বহুদিন পূর্ব্বে মফঃস্বলের এক সহরে একখানি ইংরাজি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত। কিন্তু সম্পাদক মহাশয়ের ইংরাজি লেখার সখটা যত ছিল, ইংরাজি ভাষায় জ্ঞান ততটা ছিল না। পদে পদেই তাঁর লেখায় ব্যাকরণ ভুল হইত। এইজন্য বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহাকে তম্বি করিলে, তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন যে স্কুলের ছেলেরাই ব্যাকরণের সূত্র মুখস্থ করিবে, লেখকেরা ব্যাকরণের বাঁধা-পথ ধরিয়া চলেন না, ব্যাকরণই তাঁদের লেখার অনুসরণ করিয়া আপনার সূত্র সকল রচনা করে। তাঁর উদ্ভট সাহিত্য সৃষ্টির সম্বন্ধে থাটুক আর নাই থাটুক, কথাটা যে নিতান্ত মিথ্যা, এমনও বলা যায় না। ব্যাকরণের কাঁটা-কম্পাস ধরিয়া লিখিতে গেলে, রচনা বিশুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু এসকল বাঁধাধরার ভিতরে কোথাও কোনও সরস ও শক্তিশালী জীবন্ত-সাহিত্য গড়িয়া উঠে না।

কিন্তু ব্যাকরণের বাঁধাধরার ভিতর না থাকিলেও, কোনও লেখকই, যতই প্রতিভাশালী হউন না কেন, ভাষার মূল গঠন ও প্রকৃতিকে উলট-পালট করিয়া দিতে পারেন না। ব্যাকরণ যতটা পরিমাণে ভাষার এই মূল গঠন ও প্রকৃতির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়, ততটুকু পর্য্যন্ত সকল লেখককেই ব্যাকরণের শাসন মানিয়া চলিতে হয়। এগুলি ব্যাকরণের মূল কথা। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে আবার সকল ব্যাকরণেই অনেকগুলি অবান্তর বিষয়ও মিশিয়া যায়। এই অবান্তর বিষয়গুলিই ভিন্ন ভিন্ন যুগের সাহিত্য-রথীদের লেখার উপরে গড়িয়া উঠে। এসকল অবান্তর নিয়মের কোনও বিশেষ বাধ্যবাধকতা নাই। রামমোহন রায়ের সময়ে "আমারদিগের" "তাঁহারদিগের" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইত। ক্রমে "আমাদিগের" "তাঁহাদিগের" প্রভৃতি চলিয়া গেল। এখন আমরা "আমাদের", "তোমাদের" "তাঁহাদের" লিখিয়া

থাকি। এটা একটা অবান্তর পরিবর্ত্তন। এক সময় সংস্কৃতের অনুকরণ করিয়া, বাঙ্গালা ভাষাতেও বিশেষ্য পদ স্ত্রীলিঙ্গ হইলে তার বিশেষণ পদেও স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন ব্যবহৃত হইত। কোনও কোনও স্থলে আমরা এখনও এই নিয়ম মানিয়া চলি, কোন কোনও স্থলে বা ইহাকে একেবারেই অগ্রাহ্য করিয়া থাকি। শক্তি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া, বাঙ্গালাতেও যে "এব্যক্তির কি বিপুলা শক্তি আছে"—এরূপ লিখিতে হইবে, এখন আর কেহ একথা শুনেনা; প্রায় সকলেই "বিপুল শক্তি" বলেন ও লিখেন। আবার অন্যত্র এই শক্তি শব্দের বিশেষণেও স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, অন্যথা তাহা শিষ্ট-প্রয়োগ হয় না। এই জন্য একদিকে যেমন "বিপুল শক্তি" বলি, অন্যদিকে সেইরূপ "মহৎ শক্তি" বলিনা, কিন্তু "মহতী শক্তি"ই বলিয়া থাকি। এইরূপে আজিকালিকার বড় বড় বাঙ্গালা লেখকেরা নানাদিক্ দিয়াই পুরাতন ব্যাকরণের বাঁধনগুলি আল্‌গা করিয়া দিতেছেন। ইহাতে কোনও দোষ হয়না। এরূপ করা সর্ব্বতোভাবেই সঙ্গত। লেখক-দের এই স্বাধীনতাটুকু না থাকিলে, ভাষার শক্তি ও সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিবার অবসর পায়না। কিন্তু তাই বলিয়া কোনও ভাষার মূল গঠন বা প্রকৃতিকে উলট-পালট করিয়া দিবার অধিকার কাহারও নাই।

যুগে যুগে প্রত্যেক জীবন্ত ভাষারই অশেষবিধ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। যেখানে এ পরিবর্ত্তন-ধারা বন্ধ হইয়া যায়, সেখানে হয় যে জাতি বা সমাজ ঐ ভাষা ব্যবহার করিয়া আসিতেছিল তাহাদের নূতন সাহিত্য-সৃষ্টির ও জ্ঞানার্জ্জনের শক্তি লোপ পাইয়াছে, না হয় তাহাদের প্রতিদিনের বিষয়কর্ম্মের ভাষার সঙ্গে সাহিত্যের ও উচ্চশিক্ষার ভাষার একটা অলঙ্ঘ্য প্রভেদ দাঁড়াইয়া গিয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। এই প্রভেদ যেখানে দাঁড়ায়, সেইখানেই সাহিত্যের ভাষা মৃত আখ্যা প্রাপ্ত হয়। আমাদের দেশে বহুকাল হইতেই লোকের প্রতিদিনের ব্যবহারের ভাষা ছিল এক, আর সাহিত্যের ভাষা ছিল আর এক। স্ত্রীলোকেরা ও জনসাধারণে আটপহরিয়া ভাষাই সর্ব্বদা ব্যবহার

করিতেন, পণ্ডিতেরাই কেবল সাহিত্যের পোষাকী ভাষাতে কথাবার্ত্তা কহিতেন ও গ্রন্থাদি রচনা করিতেন। এই আটপহরিয়া ভাষার সাধারণ নাম ছিল প্রাকৃত, আর ঐ পোষাকী ভাষার নাম ছিল সংস্কৃত। প্রতিদিনের কর্ম্মাকর্ম্মের ভিতর দিয়াই মানুষের নিত্য নূতন অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয়। এই কর্ম্মক্ষেত্রেই একভাষাভাষী লোকের সঙ্গে অন্যভাষাভাষী লোকের সাক্ষাৎকার ও আদানপ্রদানের সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে। সুতরাং এক নিজেদের ভিতরকার অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজন বৃদ্ধির এবং অপর বাহিরের লোকের সভ্যতা ও সাধনার সংস্পর্শের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিনের কর্ম্মজীবনের ভাষাতে নূতন নূতন ভাব আদর্শ জ্ঞান ও রস সঞ্চিত হইয়া, নানাদিক দিয়া তাহাকে ফুটাইয়া তুলে। আর যেখানে লোকের এই প্রতিদিনের ব্যবহার্য্য ভাষা হইতে তাদের লেখাপড়ার, শিক্ষাদীক্ষার, বিজ্ঞান-দর্শনের এবং বিশেষতঃ ধর্ম্মকর্ম্মের ভাষা পৃথক হইয়া পড়ে, সেইখানেই শেষের ভাষাটা মৃত পদবী প্রাপ্ত হয়। এইভাবেই আমাদের সংস্কৃতভাষা ও ইউরোপের গ্রীক্ ও ল্যাটিন্ এই দুই প্রাচীন ভাষা মৃত আখ্যা পাইয়াছে। এ সকল মৃতভাষাতে ব্যাকরণের বাঁধন বড় শক্ত। যে জীবনীশক্তি থাকিলে জীব প্রাচীনকে অতিক্রম করিয়া নূতনকে আপনার করিয়া লইতে পারে, সেই জীবনীশক্তির অভাবেই এই সকল পুরাতন মৃতভাষা এমন কঠিন বাঁধাবাঁধির ভিতরে পড়িয়া আছে। প্রতিদিনের কর্ম্মের সঙ্গে এসকল ভাষার কোনও বিশেষ সম্পর্ক নাই বলিয়া, এই বাঁধন কাটিয়া মুক্তিলাভ করিবার কোনও প্রেরণাও এক্ষেত্রে উপস্থিত হয়না। কিন্তু চল্‌তি ভাষাকে এরূপ বাঁধাবাঁধির ভিতরে আটকাইয়া রাখা যায়না। যে চল্‌তে চায়, যাকে চল্‌তে হয়ই, সে কোনওরূপ অলঙ্ঘ্য বিধি-বাঁধন মানিয়া চলিতে পারেনা। সে আপনার বিধি আপনি গড়িয়া তোলে, আপনার বাঁধন আপনি ছিঁড়িয়া ফেলে। ইহা জীবনেরই ধর্ম্ম।

জীবন্তভাষা কতকটা জীবন্ত মানুষেরই মতন। জীবন্ত মানুষকে

সর্ব্বদাই আপনার চারিদিকের অবস্থা ও ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি করিয়া চলিতে হয়, না চলিলে তার জীবন-রক্ষা অসম্ভব হইয়া উঠে। প্রত্যেক জীবকে এই যে তার চারিদিকের অবস্থা ও ব্যবস্থার সঙ্গে সর্ব্বদা মিশ খাইয়া চলিবার চেষ্টা করিতে হয়, এই চেষ্টাকেই আধুনিক জীব-বিজ্ঞান জীবন-সংগ্রাম বা ইংরাজিতে struggle for existence বলে। সকল জীবকেই যেমন আপনার জীবন-রক্ষার জন্য আপনার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ব্যবস্থার সঙ্গে সমন্বয় ও সঙ্গতি সাধন করিতে যাইয়া, নিজেকে তাদের প্রয়োজন অনুরোধে কতকটা বদলাইয়া লইতে হয়, জীবন্ত ভাষাকেও সেইরূপ না করিলে চলেনা। নূতন নূতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে নূতন নূতন শব্দের, নূতন নূতন ভাবের স্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন রসের উপাদানের, নূতন নূতন সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন বিচার যুক্তির, আর এই সকল বিচার যুক্তির প্রয়োজনে নূতন নূতন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সৃষ্টি হইবেই হইবে। এই নূতন সৃষ্টি প্রবাহের দ্বারা সাহিত্যের ধরণধারণের বা এবারতেরও পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। এক যুগের এবারত বা style এই কারণেই অন্য যুগের এবারত হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। মহারাণী-এলিজাবেথের সময়ে যে ইংরাজি এবারত ছিল, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সমকালে তাহার ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘটে। আবার ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে ইংরাজ লেখকেরা যে ধরণের ইংরাজি লিখিতেন, এই অল্প দিনের মধ্যেই তাহা বদলাইয়া গিয়া, আজিকালিকার ইংরাজি সাহিত্যে একটা নূতন এবারতের প্রতিষ্ঠা হইতেছে। আমাদের বাঙ্গালা ভাষাতেই রামমোহন রায়ের এবারতে আর বিদ্যাসাগরের এবারতে, বিদ্যাসাগেরের এবারতে আর বঙ্কিমচন্দ্রের যুগের এবারতে এবং তার পরে রবীন্দ্রনাথ যে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন বাঙ্গালা গদ্য এবারতের সৃষ্টি করিয়াছেন, এ সকলের মধ্যে কত প্রভেদ দেখিতে পাই। কোনও জাতির মানস ও সমাজ-জীবনে

নূতন সৃষ্টিপ্রবাহ যতদিন অপ্রতিহত থাকে, জ্ঞানের ধারা যতদিন না বদ্ধ হইয়া যায়, অভিনব অভিজ্ঞতা লাভের পথ যতদিন না রুদ্ধ হইয়া পড়ে, ততদিন প্রত্যেক জীবন্ত জাতির জীবন্ত ভাষাতে এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিবেই ঘটিবে। এ সকল পরিবর্ত্তন দেখিয়া ভয় পাইলে চলিবে না। এ সকল অপরিহার্য্য পরিবর্ত্তনকে প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াও কোনও ফল নাই। তবে পরিবর্ত্তনের মধ্যেও যে একটা নিত্যত্ব আছে, সকল পরিবর্ত্তনই যে ভাল ও ইষ্টকর নয়, এই সকলের যে ইষ্টানিষ্ট, উৎকর্ষাপকর্ষ, আবশ্যক-অনাবশ্যক, ভিতরের প্রেরণার ও বাহিরের আক্রমণের, স্বাধীনতার ও স্বেচ্ছাচারের ভেদাভেদ আছে,—এই কথাটাও ভুলিয়া গেলে চলিবেনা। যার হাতে কলম, দোয়াতে কালী ও ঘরে পয়সা আছে, জীবন্ত ভাষা বলিয়া এই জীবনের অজুহাতে সে-ই যে বাঙ্গালা ভাষাটাতে যা' তা' পরিবর্ত্তন চালাইয়া দিবার অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবে, ইহার প্রশ্রয় দিলে চলিবেনা। জীবনের অপরাপর ক্ষেত্রে যেমন, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সেইরূপ স্বাধীনতাকেই বরণ করিতে হইবে, স্বেচ্ছাচারিতাকে স্বাধীনতা বলিয়া ভুল করিলে চলিবে না। প্রত্যেক মানুষের যেমন একটা স্ব-বস্তু আছে, প্রত্যেক ভাষারও সেইরূপ একটা স্ব-বস্তু আছে। আমাদের বিশিষ্ট প্রকৃতিকেই আমরা আমাদের এই "স্ব" বলিয়া থাকি। এই "স্ব" আমাদের নিজস্ব বস্তু, ইহাতেই আমাদিগকে জগতের অপর সকল জীব ও সকল পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে। রাম যে শ্যাম নহে, তার এই "স্ব"ই তার প্রমাণ। এই যে "স্ব" বস্তু—তার অধীনতাই স্বাধীনতা। স্বেচ্ছা বস্তু এই "স্ব"এর ইচ্ছা, তার একটা ক্ষণিক চাঞ্চল্য মাত্র, এই সকল ইচ্ছা জাগে আর যায়, এই ইচ্ছার সঙ্গে "স্ব"এর কোনও নিত্য সম্বন্ধ নাই। শত শত পরস্পর বিরোধী ইচ্ছা বা বাসনা আমাদের মনে জাগে। আর যখন যে বাসনা এরূপভাবে প্রাণে জাগিয়া উঠে, আমরা যদি তখনই নিজেদেরে তার

হাতে সমর্পণ করি, তাহা হইলে আমাদের জীবনে কোনও প্রকারের স্থৈর্য্যলাভ ও শক্তিসাধন অসাধ্য হইয়া উঠে। জীবনের থেই রাখাই সে অবস্থায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই জন্যই স্বেচ্ছাচার আর স্বাধীনতা এক কথা নহে। জীবনের মৌলিক একত্বের বা নিজত্বের বা ব্যক্তিত্বের বা বৈশিষ্টের অনুগত হইয়া, আপনার সম্পূর্ণ সার্থকতা অন্বেষণ করাই স্বাধীনতা ; আর ক্ষণিক বাহ্যপ্রেরণাধীন বাসনার বশ্যতা স্বীকার করিয়া কখনও এদিকে কখনও ওদিকে ছিন্নাভ্রের মতন ভাসিয়া বেড়ানই স্বেচ্ছাচারিতা। স্বাধীনতা যেমন জীবনকে সর্ব্বতো-ভাবে সার্থক করে, এই স্বেচ্ছাচারিতা সেইরূপ তাহার সকল অর্থকে ব্যর্থ করিয়া দেয়।

আমাদের প্রত্যেকের যেমন একটা স্ব-বস্তু আছে, যাহার উপরে আমাদের জীবনের একত্ব প্রতিষ্ঠিত, যাহা আমাদের নিজস্ব ও সর্ব্বস্ব, যাহার দরুণে আমরা জগতের অপর সকল লোক হইতে পৃথক হইয়া আছি, সেইরূপ প্রত্যেক ভাষারও একটা "স্ব-বস্তু" আছে, এই বস্তুই তার নিজস্ব ও সর্ব্বস্ব। এই 'স্ব'এর উপরেই ভাষার সকল প্রকারের পরিবর্ত্তন ফুটিয়া উঠে। যেমন মানুষের মধ্যে নিত্যই অশেষবিধ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, অথচ এই সকল পরিবর্ত্তনে তাহাদের একত্ব বা নিজত্ব বা ব্যক্তিত্ব একটুও নষ্ট হয় না, সেইরূপ প্রত্যেক জীবন্ত ভাষাতেও প্রতিদিনই বহুবিধ পরিবর্ত্তন ঘটে, কিন্তু এ সকল পরিবর্ত্তনে তার নিজত্ব বা ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্টকে ফুটাইয়াই তুলে, কদাপি নষ্ট করে না। এই যে ভাষার স্ব-বস্তু, তাহার অধীনতাই সাহিত্যিকের সত্য স্বাধীনতা। সাহিত্যিক যতক্ষণ ভাষার এই স্ব-বস্তুর অধীনে থাকেন, অর্থাৎ যতক্ষণ তিনি যে ভাষায় গ্রন্থাদি রচনা করেন, তাহার মূল, নিজস্ব, বিশিষ্ট প্রকৃতির নিয়ম মানিয়া চলেন, ততক্ষণ তিনি যত ইচ্ছা পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করুন না কেন, তাহার অন্য দোষগুণ যাহাই থাকুক না, তাহাকে কখনও স্বেচ্ছাচারিতা বলা যাইবে না। কিন্তু এসকল পরিবর্ত্তন ঘটাইতে যাইয়া যখন তিনি

ভাষার মূল গঠন ও প্রকৃতিকে পর্য্যন্ত উলট-পালট করিয়া দিতে চেষ্টা করেন, তখনই তাঁর এ চেষ্টাকে স্বেচ্ছাচারিতা বলিতে হইবে।

জীবন্ত ভাষার অশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিবে, ইহা জীবনেরই লক্ষণ। ইহাতে ভয় পাইবার কোনও কারণ নাই। কিন্তু পরিবর্ত্তন বলিলেই যে তার মূলে একটা নিত্যত্ব আছে, ইহা বুঝায়,—এই গোড়ার কথা-টাও ভুলিয়া গেলে চলিবে না। যেখানে কিছু নিত্য নাই, সেখানে পরিবর্ত্তন হয় না। খোল ও নাড়িচা সবই যদি বদলাইয়া যায়, তাকে পরিবর্ত্তন বলে না। যেখানে কিছু অপরিবর্ত্তিত ও অপরিবর্ত্তনীয় থাকে না, সেখানে আমরা কোনও পরিবর্ত্তনের কল্পনাও করিতে পারি না। রামের জ্বর হইয়াছে, যদু ঔষধ খাইতেছে, শ্যাম আরোগ্য লাভ করি-য়াছে, মাধব স্নান-আহার করিয়া আফিসে গেল। এইগুলিকে পরি-বর্ত্তন বলে কি? অথচ যে রামের জ্বর হইয়াছে, সেই রামই ঔষধ খাইতেছে, সেই রামই আরোগ্য লাভ করিল, সেই স্নানাহার করিয়া আফিসে গেল—এখানে জ্বর হওয়া অবধি, আফিসে যাওয়া পর্য্যন্ত যে সকল ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও কর্ম্মের প্রকাশ হইল, তাহাকে পরিবর্ত্তন বলি। কারণ এখানে রামরূপ ব্যক্তিটা সকল অবস্থার ও সকল কর্ম্মের মধ্যেই বিদ্যমান রহিয়াছে। আমি জন্মিয়াছিলাম একদিন, আমি বালক ছিলাম, আমি যুবক ছিলাম, আমি প্রৌঢ় ছিলাম, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, —জন্ম, বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্যাদি অবস্থা পর পর ঘটিয়াছে বলিয়াই এগুলিকে পরিবর্ত্তন বলি না, কিন্তু এই "আমি" বস্তুটা এসক-লের সাক্ষীরূপে বিদ্যমান ছিল ও আছে বলিয়াই এগুলিকে পরিবর্ত্তন বলিতে পারি। সেইরূপ যুগে যুগে ভাষার পরিবর্ত্তন ঘটে ও ঘটিতেছে, ইহা বলিলে বা মানিয়া লইলেই, এই ভাষার যে একটা নিত্য ও অপরি-বর্ত্তনীয় স্বরূপ আছে, ইহাও মানিতেই হইবে। ঐ নিত্য স্বরূপের উপরে, ঐ স্বরূপের আশ্রয়েই, ভাষার যাহা কিছু বিভিন্ন রূপ ফুটিয়া উঠে। আমাদের বাঙ্গালা ভাষারও এরূপ একটা নিত্য স্ব-রূপ আছে। ঐ স্বরূপটাই তার প্রাণ। ঐটা গেলে তার সব গেল।

মনের ভাব ব্যক্ত করাই ভাষার ধর্ম্ম। আর এই ধর্ম্মের প্রেরণায় প্রত্যেক ভাষাই মনের অনুগমন করিয়া চলে। আমাদের মন যেরূপ প্রণালীতে চিন্তা করে, ভাষা সেই ছাঁচে আপনা হইতেই গড়িয়া উঠে। আমাদের চিন্তার উপাদান তিনটী, এক জ্ঞাতা বা বিষয়ী, ইংরেজিতে ইহাকে সব্‌জেক্ট subject বলে; দ্বিতীয় জ্ঞেয় বা বিষয়, ইংরেজিতে ইহাকে অব্‌জেক্ট object বলে; আর তৃতীয় এই জ্ঞাতা বা বিষয়ীর সঙ্গে এই জ্ঞেয় বা বিষয়ের সম্বন্ধ, ইহাকেই ইংরেজিতে প্রেডিকেট্ predicate কহিয়া থাকে। মানুষ যখনই কোনও মনন করে, তখনই সে এই তিনটী বস্তুকে লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া থাকে। এই সব্‌জেক্ট subject, অব্‌জেক্ট object, এবং প্রেডিকেট্ predicate'কে কর্ত্তা, কর্ম্ম এবং ক্রিয়াও বলা হয়। জ্ঞানের সম্বন্ধে যে বিষয়ী, কর্ম্মের সম্পর্কে সেই কর্ত্তা। জ্ঞানের সম্বন্ধে যাহা বিষয়, কর্ম্মের সম্পর্কে তাহাই কর্ম্ম। আর জ্ঞানের দিক্ দিয়া যাহাকে বিষয়-বিষয়ীর সম্বন্ধ বলা যায়, কর্ম্মের দিক্ দিয়া তাহাকেই ক্রিয়া বলিতে হয়। মূলবস্তু এক হইলেও, জ্ঞানের বিশ্লেষণে তাহার এক নাম ও কর্ম্মের বিশ্লেষণে অন্য নাম ব্যবহৃত হয়। ফলতঃ ও বস্তুতঃ যাহা বিষয়ী তাহাই কর্ত্তা, যাহা বিষয় তাহাই কর্ম্ম, যাহা বিষয়-বিষয়ীর সম্বন্ধ তাহাই ক্রিয়া। আর এই তিনটী তত্ত্বই আমাদের সকল প্রকারের চিন্তার বা মননের বা ধারণার বা জ্ঞানের মূল উপাদান। এগুলির কোনওটিকে ছাড়িয়া কোনও প্রকারের চিন্তন বা মনন বা জ্ঞানলাভ সম্ভব হয় না। জ্ঞানের এই তিনটী মূল উপাদান সকল ভাষাতেই পাওয়া যায়; তবে কোনও ভাষাতে বা কর্ত্তার, কোনও ভাষাতে বা কর্ম্মের, আর কচিৎ কোনও কোনও অপেক্ষাকৃত অপরিণত ও বর্ব্বর জাতির ভাষায় বা ক্রিয়ারই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ত্তা, কর্ম্ম, ও ক্রিয়াপদ এই তিনটীর কোথায় কিরূপ সমাবেশ হয়, তাহার দ্বারাই ভিন্ন ভিন্ন ভাষার মূল গঠন ও প্রকৃতিটা যে কি, ইহা বুঝিতে পারা যায়। আমাদের

সংস্কৃত ভাষায় কর্ত্তৃপদেরই প্রাধান্য বেশী। প্রত্যেক বাক্যের সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানের আসনটা আমরা কর্ত্তাকেই দিয়া থাকি। তারপরে কর্ম্ম-পদকে বসাই এবং সকলের শেষে ক্রিয়াপদের স্থান করিয়া দেই। বাংলা প্রভৃতি দেশজ ভাষাও এবিষয়ে সংস্কৃতেরই অনুকরণ করে। এই যে কর্ত্তৃপদ, কর্ম্মপদ, ও ক্রিয়াপদের পরপর সমাবেশ ইহার দ্বারাই সংস্কৃত ভাষার মূলগঠন ও প্রকৃতিটি বুঝিতে পারা যায়। এটি কেবল আমাদের জাতির ভাষার প্রকৃতি নহে, আমাদের জাতীয় চিন্তারও প্রকৃতি এবং গঠন ইহাই। ফলতঃ ভাষার প্রকৃতি ঐ চিন্তার প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন হয়। যে যেমন ভাবে চিন্তা করে, তার ভাষাও সেইরূপ ভাবেই প্রকাশিত হয়। যার চিন্তাতে বিষয়ী বা কর্ত্তা সকলের আগে আসে, তার ভাষাতেও কর্ত্তৃপদ আপনা হই-তেই সকলের আগে বসিবে। আমরা কর্ম্মের আগে কর্ত্তার কথাই ভাবি, আর সকলের শেষে ক্রিয়াকে লক্ষ্য করি। রাম ভাত খাইতেছে—আমরা এই ভাবেই পদযোজনা করিয়া থাকি। এটি আমাদের জাতির চিন্তার ধাত। এখন যদি আমরা বলিতে বা লিখিতে আরম্ভ করি—ভাত রাম খাইতেছে, কিম্বা খাইতেছে ভাত রাম, কিম্বা রাম খাইতেছে ভাত,—রামের আহার ব্যাপারটা সকল বাক্যেই সমানরূপে প্রকাশ পাইবে বটে, কিন্তু আমাদের মনের গতির ধরণটা ঠিক সমান আছে বলিয়া প্রমাণ হইবে না। আমরা যে কর্ত্তৃপদকে সকলের আগে বসাই, ইহার অর্থ এই যে, আমরা অতি প্রাচীনতম কাল হইতে, যে যুগের খবর কেবল লিখিত ইতিহাস নহে, কিন্তু খোদিত প্রস্তরফলক বা তাম্রলিপি প্রভৃতিও কিছুই জানে না, সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে, আমরা যে জাতিতে জন্মিয়াছি ও উত্তরাধিকারীসূত্রে যাঁদের ভাষা ও সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ভোগ করিতেছি, তাঁদের চক্ষে চিরদিনই বিষয় অপেক্ষা বিষয়ী বড় ছিলেন। অহংটাই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য হইয়াছিল, ইদংটা উপলক্ষ্য মাত্র ছিল। তাঁরা চিরদিনই কর্ত্তাকে কর্ম্ম অপেক্ষা ও

কর্ম্মকে ক্রিয়া অপেক্ষা বড় বলিয়া ভাবিতেন। কর্ত্তাটা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী-বস্তু, কর্ম্মটা কর্ত্তার তুলনায় ক্ষণস্থায়ী হইলেও, ক্রিয়ার শেষেও তার অস্তিত্ব থাকে বলিয়া, ক্রিয়া অপেক্ষা বেশী স্থায়ী। রাম বিষয়ী; এই রামের অগণ্য ভোগ্যবস্তুর বা বিষয়ের মধ্যে ভাত একটা বিশিষ্ট বিষয় মাত্র, সুতরাং এখানে ইহা রামের চাইতে ছোট। রামের জন্যই আমাদের চোখ ভাতের উপরে পড়িয়াছে। রাম ভাত না খাইয়া যদি ডা'ল খাইত বা শাক খাইত, বা দই বা মাখন খাইত, তাহা হইলে এই ভাতের দিকে আমরা এ সময়ে চোখ তুলিয়া চাহিতাম না। এইজন্য রামই এখানে মুখ্যবস্তু, ভাত গৌণ। আর সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষণস্থায়ী, সর্ব্বাপেক্ষা ছোট ব্যাপার এখানে খাওয়াটা। রামের খাওয়া শেষ হইলেও ভাতও থাকিতে পারে, রামও থাকিবে; ভাত তখন অপরের জন্য থাকিবে, রাম তখন অন্য কাজ করিবে, কিন্তু খাওয়ারূপ কার্য্যের আর অস্তিত্ব রহিবে না। এইজন্য ক্রিয়াটা সকলের ছোট, সর্ব্বাপেক্ষা হেয়; আর এই কারণেই কর্তৃপদ ও কর্ম্মপদ উভয়ের পরে ক্রিয়াপদের সন্নিবেশ হইয়া থাকে। এটি আমাদের ভাষাতেই হয়। প্রাচীন সংস্কৃতে ও আধুনিক দেশজ ভাষাতে হয়। অন্য দেশের ভাষায় হয় না। এই যে ভাষার গঠন বা প্রকৃতি ইহা একটা আকস্মিক ব্যাপার নহে। ইহার সঙ্গে আমাদের জাতির চিন্তার মূলপ্রকৃতির ও প্রণালীর অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। এটি আমাদের জাতির চিন্তার, আমাদের জাতির সাধনার ও সভ্যতার, আমাদের দর্শনের ও ধর্ম্মের নিজস্ব সহি-মোহর। ইহা আমাদের জাতীয়তার মার্কা। এটি ক্ষইয়া গেলে বা মুছিয়া ফেলিলে, ভারতের ভারতত্ব, হিন্দুর হিন্দুত্ব, আমাদের সভ্যতা ও সাধনার মূলগত বৈশিষ্টটুকু—নষ্ট হইয়া যাইবে।

ইংরাজি ভাষার প্রকৃতি একটু ভিন্ন। আমরা যেমন কর্ত্তাকে সকলের আগে বসাই, ইংরাজেরাও তাই করেন। কিন্তু আমরা যেখানে বলি "রাম ভাত খাইতেছে", সেখানে তাঁরা বলেন "রাম খাই-

তেছে ভাত।" বাঙ্গালা ভাষায় কর্ত্তৃপদের পরে কর্ম্মপদ ও সকলের শেষে ক্রিয়াপদ বসে। ইংরাজিতে কর্ত্তৃপদের পরে ক্রিয়াপদ আর সকলের পরে কর্ম্মপদ বসে। রামের ভাত খাওয়ার ব্যাপারটা ইংরাজিতে Ram is eating rice—রাম খাইতেছে ভাত,—এই ভাবেই ব্যক্ত হইবে। Ram rice is eatting ইংরাজি নয়, বাঙ্গালা। সেইরূপ "রাম খাচ্ছে ভাত," বাঙ্গালা নয়, ইংরাজি। এরূপ ভাবে কথাগুলি উলট্‌পালট্‌ করিয়া ব্যবহার করাতে একটা বাহাদুরী আছে। কোনও কোনও স্থলে যে ব্যভিচারও বাহাদুরী বলিয়া গণ্য হয়, ইহাই বা কে না জানে?

ইংরাজিতে যে কর্ত্তৃপদের পরে ক্রিয়াপদ বসে, ইহার অর্থই এই যে অতি প্রাচীনতম প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে, ইংরাজ জাতির চিন্তাটা এমনি ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে যে তারা ক্রিয়াটাকেই কর্ম্মের চাইতে বড় মনে করে। কর্ত্তা যে সকলের চাইতে বড়, তাহা তাঁর ক্রিয়ারই জোরে। ক্রিয়া ভিন্ন কর্ত্তা লোপ পাইয়া যায়। কর্ম্মটা ক্রিয়ার অধীন। যতক্ষণ খাই, ততক্ষণই ভাতের দাম আছে; খাওয়া শেষ হইলে ভাতের আর অব্যবহিত প্রয়োজন থাকে না। প্রয়োজন যার নাই, মূল্যই তার আছে কি? তখন ভাতের যা মূল্য থাকে, তাহা ভবিষ্যতের খাওয়ারই বা ক্রিয়ারই জন্য। সুতরাং ইংরাজেরা ক্রিয়াটাকেই—প্রেডিকেট্‌কেই—কর্ম্ম বা অবজেক্ট অপেক্ষা আগে দেখে ও বড় ভাবে। ক্রিয়াই কর্ম্মকে পূর্ণ করে ও কর্ত্তাকে সার্থক করে। ক্রিয়ার বা কর্ম্মের বিরাম যেমন নাই, তেমনি কোনও নিত্যত্বও নাই। কিন্তু কর্ত্তার একটা নিত্যত্ব আছে। এই জন্য কর্ত্তা সকলের বড়। তার পরে ক্রিয়া; কারণ, ক্রিয়ার দ্বারাই তাঁর কর্ত্তৃত্বের প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা হয়। কর্ম্ম ক্রিয়ার অধীন, ক্রিয়ার দ্বারা উৎপন্ন বা সৃষ্ট হয়। সুতরাং কর্ম্ম সকলের পরে। এইভাবে ইংরাজি ভাষার মূলপ্রকৃতি ও গঠনের তত্ত্বান্বেষণে গেলে, ইংরাজি ব্যাকরণের ভিতরেই ইংরাজের জাতীয় দর্শন বা তত্ত্ববিদ্যার পরিচয় পাই।

ইংরাজ কর্ম্মী, সুতরাং ক্রিয়াটা তার চক্ষে অতি বড় বস্তু। ইংরাজের দেবতা Providence, জগতের তিনি স্রষ্টা, জীবের তিনি পাতা, মানুষের তিনি ত্রাতা, বিশ্বের বিশাল কর্ম্মযন্ত্রের তিনি নিয়ন্তা। এই সকলই তাঁর নিয়ত-ক্রিয়াশীলতার লক্ষণ। কিন্তু আমাদের ব্রহ্ম নিগুর্ণ, নির্ব্বিশেষ, নিষ্ক্রিয়। সত্তাই তাঁর সকল সত্য। অঘটনঘটন-পটীয়সী মায়া বিশ্ব সৃজন করে। ব্রহ্মকে জগতের স্রষ্টা বলা যায় না। তিনি জীবের পাতাও নহেন, সে কার্য্য বিষ্ণু করেন। তিনি জীবের মুক্তিদাতাও নহেন, কারণ মুক্তি নিত্যসিদ্ধ বস্তু, কোনও ক্রিয়ার ফলে তার উদ্ভব হয় না। যাহা নিত্য তারই উপরে আমাদের মনের ঝোঁক, যাহা ক্রিয়াজন্য ও পরিণামী তার উপরে নহে। এই জন্য আমরা প্রথমে কর্ত্তাকে দেখি, তার পরে কর্ত্তার কর্ম্মকে দেখি, সকলের শেষ, অতি চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী যে ক্রিয়া তাহাকে দেখিয়া থাকি। সুতরাং আমাদের ভাষায় যে কর্ত্তা, কর্ম্ম, ও ক্রিয়ার পর পর সমাবেশ হয় ইহা একটা অর্থহীন ব্যাপার বা নিতান্ত অবান্তর কথা নহে। ইহার সঙ্গে আমাদের জাতির মূল ধাতের সম্বন্ধ আছে। এখানে ভাষার উলট্‌পালট্ করিবার খেয়ালটা কেবল ভাষাতে নয়, জাতির মূল প্রকৃতির ভিতরে একটা সাংঘাতিক বিপ্লব আনিবার চেষ্টা করে।

কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া, এই পর্য্যায়টা বাঙ্গালা ভাষার সাধারণ নিয়ম। কিন্তু সঙ্গত কারণ উপস্থিত হইলে সকল নিয়মেরই ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। এই পর্য্যায় সংস্কৃতেরও সাধারণ নিয়ম। কিন্তু তাই বলিয়া "অস্তি গোদাবরী তীরে বিশাল শাল্মলীতরু:"—বিষ্ণুশর্ম্মার এই নিয়মভঙ্গটাকে কেহই ব্যভিচার বলিবে না। ভাষাটা যে হামেষাই দর্শনের অনুশাসন মানিয়া চলিবে, শ্রবণের কোনও অনুরোধ শুনিবে না, এমনও কোনও কথা নাই। দর্শনটা ভাষার কাঠাম, শ্রবণটা তার রক্তমাংস না হউক, অন্ততঃ অঙ্গকান্তি ত বটেই। দর্শন সর্ব্বদাই বলে—কর্ত্তাই সকলের বড়, তাহাকেই আগে বসাও। কিন্তু শ্রবণ

কখনও সেই কর্ত্তাকেই সাজাইবার জন্য বলিতে পারে, ক্রিয়া সকলের ছোট হইলেও তাহাকেই এখানে আগে বসাইলে দেখাবে বা শুনাবে ভাল। তখন ঐরূপ করাতে কোনও ব্যভিচার-দোষ হয় না। আর ক্রিয়াতে ক্রিয়াতেও বেশকম আছে। সংস্কৃতে ভূ ধাতু সকল ধাতুর বড়। কর্ত্তার সঙ্গে তার সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ট। কর্ত্তা অসংখ্য কর্ম্ম করেন, কিন্তু ভূ ধাতু যে ক্রিয়াকে নির্দ্দেশ করে, সে ক্রিয়াটা তাঁর নিত্যক্রিয়া; ঐটির উপরে তাঁর অপর সকল কার্য্যের প্রতিষ্ঠা হয়। এই জন্য "অস্তি", ক্রিয়াপদ হইয়াও, যতটা জোর করিয়া বাক্যের সকলপদের প্রথমে যাইয়া বসিতে পারে, অপর ক্রিয়াপদে সর্ব্বদা তাহা পারে না। যেখানে ক্রিয়ার উপরেই জোর দিতে চাই, কর্ত্তা বা কর্ম্মের উপরে নহে,—ক্রিয়াটাই যেখানে আমাদের চিন্তার বা মননের বা জ্ঞানের মুখ্যবস্তু, সেখানে ক্রিয়া ত বাক্যের প্রথমে আপনি আসিয়া বসিবেই। "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"—এখানে শুনানটাই মূল কথা, সুতরাং "শৃণ্বন্তু" বলিয়া বাক্যের সূচনা হওয়াই সত্য ও স্বাভাবিক। বাঙ্গালাতেও "যাচ্ছে কেমন", "খাচ্ছে কেমন", "গাচ্ছে কেমন", এ সকল অতি শিষ্ট-প্রয়োগ। যাওয়া, খাওয়া, গাওয়া, প্রভৃতি ক্রিয়ার উপরেই বক্তার মনের ঝোঁক রহিয়াছে, আর মনের ঝোঁক যার উপরে, ভাষাতে সে'ই সকলের আগে আসিবে, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু সচরাচর সহজ অবস্থায় আমাদের মনের ঝোঁকটা কর্ত্তার উপরেই পড়ে, ক্রিয়ার উপরে পড়ে না বলিয়া, ভাষার সাধারণ নিয়ম এই যে কর্ত্তৃপদই বাক্যের সকলের আগে বসিবে। যেখানে কর্ম্ম বা ক্রিয়াপদ প্রথমে বসে সেখানে কোনও বিশেষ কারণে বক্তা বা লেখকের দৃষ্টি কর্ত্তার উপরে আগে না পড়িয়া কর্ম্ম বা ক্রিয়ার উপরে পড়িয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। আর এই বিশেষ কারণটা সঙ্গত এবং যথেষ্ট কি না, তারই উপরে এরূপ প্রয়োগ শিষ্টপ্রয়োগ না অপপ্রয়োগ, ইহা নির্ভর করিবে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

"ডালিম"

তখন আমার চল্লিশ পার হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু আমোদ প্রমোদ ছাড়ি নাই। ছাড়িও নাই, ছাড়িতে চেষ্টাও করি নাই। আমি কোন কালেই মানুষ বড় ভাল ছিলাম না। সংসারের আমোদ আহ্লাদের সঙ্গে কেমন একটা প্রাণের যোগ ছিল; আমার মনে হইত কখনও সেই যোগভ্রষ্ট হইব না। সমস্ত যৌবনটা এক-রজনীর উৎসবের মত কাটাইয়া দিয়াছি। কখন আরম্ভ হইল কখন শেষ হইল বুঝিতেও পারিলাম না। কোনও সুখ হইতে আপনাকে কখনও বঞ্চিত করি নাই, আর তার জন্য কোনও আপশোষও হয় নাই। প্রাণের মাঝে যে একটা মুক্ত আকাশ, একটা গভীর পাতাল—আছে তাহা তখন বুঝিতাম না। জীবনটা সর্ব্বদাই এক বিশাল সমতল ভূমির মত মনে হইত, জীবনের রাজপথে ফুল কুড়াইতে কুড়াইতে আর হাসি ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়া যাইতাম। কখনও পায় কাঁটার আঁচড় লাগে নাই। কখনও প্রাণে দাগ বসে নাই। সমস্ত আমোদ প্রমোদের মধ্যে বিনা চেষ্টায় সহজেই প্রাণটাকে আস্ত রাখিয়াছিলাম। কিন্তু আজ প্রায় বুড়া হইতে চলিলাম, আজ তার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া জীবন অন্ধকার হইয়াছে। সে কতদিনকার কথা। তারপর কত বৎসর চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে আর ভুলিতে পারিলাম না। কত খুঁজিয়াছি—কোথাও পাইলাম না। সে যে অদৃশ্যভাবে আমার আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়—ধরা দেয় না। তাহার পদধ্বনি শুনিতে পাই, তাহাকে দেখিতে পাই না। চোখ বুজিলে তাহাকে বুকের ভিতর পাই, চোখ মেলিলে কোথায় মিলাইয়া যায়। আজও তাহাকে খুঁজিতেছি, জীবনের অবশিষ্ট কাল বুঝি খুঁজিতে খুঁজিতেই কাটিয়া যাইবে। তাহাকে পাইব না? আমি যে তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছি।

তাহার নাম জানি না, সকলে তাহাকে "ডালিম" বলিয়া ডাকিত।

সে দেখিতে সুন্দর কি কুৎসিত আমি এখনও বলিতে পারি না। কিন্তু তার মুখখানি এখন পর্য্যন্ত আমার প্রাণে প্রদীপের মত জ্বলিতেছে! মাথায় অন্ধকারের মত এক রাশ চুল, মুখে একটা গভীর পাগল-করা ভাব, আর তার চোখ দুটী?—চাহিবামাত্র আমার চোখ ছল ছল করিয়া উঠিয়াছিল। আজ পর্য্যন্ত অনেক রমণীর সঙ্গে মিশিয়াছি, আমোদ প্রমোদ করিয়াছি, কিন্তু এমন বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি, চোখে এমন গদ্‌গদ্‌ করুণভাব আর কখনও দেখি নাই। বোধ হয় আর কখনও দেখিবও না।

সেদিন সন্ধ্যাকালে কয়জন বন্ধু লইয়া বাগানে আমোদ প্রমোদ করিতে গিয়াছিলাম। পূর্ণ বাবুর বাগান চাহিলেই পাওয়া যাইত, আমরা চাহিয়া লইয়াছিলাম। বাগানটী খুব বড়, ফটক হইতে সরু একটা রাস্তা ধরিয়া অনেক দূর গেলে বাড়ীটা পাওয়া যায়। বাড়ীর সাম্‌নেই একটা ঘাট-বাঁধন পুকুর। ঘাটের ঠিক উপরেই সান-বাঁধান লতামণ্ডপ। সেই সরু রাস্তা ধরিয়া, সেই লতামণ্ডপের ভিতর দিয়া, বাড়ীর ভিতরে যাইতে হয়। সেদিন বন্দোবস্তের কোন অভাব ছিল না। নানা রকমের প্রচুর সুরা, নানা রকমের খাবার, আলোয় আলোয় প্রমোদ-মন্দির দিনের মত জ্বলিতেছিল।

আমার পৌঁছিতে একটু দেরী হইয়াছিল। ফটকে নামিয়াই সেই সরু রাস্তা। চাঁদের আলো খুব ক্ষীণ হইয়া ছায়ার মত সব ঢাকিয়াছিল। নানা ফুলের গন্ধে, সেই ম্লানছায়ালোকে, লতাপল্লবের মর্ম্মরধ্বনিতে সেই সরু রাস্তাটীকে যেন জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছিল। আমার মনে কি হইতেছিল আমি ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু প্রত্যেক পদধ্বনিতে কে যেন আমাকে সাবধান করিয়া দিতেছিল। সে রাস্তায় অনেকবার গিয়াছি, সেই বাগানে অনেক প্রমোদ-রাত্রি কাটিয়াছে, কিন্তু সর্ব্বদাই হাল্‌কা মনে স্ফূরতি করিতে গিয়াছি। সেদিন আমার প্রাণে কোথা হইতে একটা ভার চাপিয়াছিল। সে যে কেমন ভার আমি কিছুতেই বুঝাইয়া বলিতে পারি না।

আমি আস্তে আস্তে সেই বাড়ীতে ঢুকিলাম। সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে, গান হইতেছে, শুনিলাম। পরিচিত গায়িকা গাইতেছে—"চমকি চমকি যাও"। ঘুঙুরের শব্দ শুনিলাম। নৃত্যগীতে আমার মন নাচিয়া উঠিত। কিন্তু সেদিন কি জানি কিসের ভারে আমাকে চাপিয়া রাখিয়াছিল। আমি স্বপ্নাবিষ্টের মত আস্তে আস্তে উঠিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলাম।

তখনও নাচ হইতেছে। সেই গায়িকা হাত ঘুরাইয়া নাচিয়া নাচিয়া গাহিতেছে "চমকি চমকি যাও"! আমাকে দেখিয়াই আমার বন্ধুরা সব চেঁচাইয়া উঠিল—"কেয়া বাৎ কেয়া বাৎ, দাদা আগিয়া"। একজন বলিল, "দাদা এই লাও একপাত্র চড়াও, আনন্দ কর"। আর একজন গান ধরিল "এত গুণের বঁধু হে"। আমার এক বন্ধু উঠিয়া নাচিয়া নাচিয়া গাহিতে লাগিল—"কাঁটা বনে তুল্‌তে গিয়ে কলঙ্কেরি ফুল! ওগো সই কলঙ্কেরি ফুল!" আর একজন উঠিয়া আমার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া গাহিল "দেখ্‌লে তারে আপন হারা হই"। আমার আর একজন বন্ধু একটা গেলাসে মদ ঢালিয়া আমার হাতে দিয়া গাহিলেন "দাদা হেসে নাও দুদিন বইত নয়, কি জানি কখন সন্ধ্যা হয়!" সবার হাতে মদের গেলাস, মদের গন্ধ, ফুলের সৌরভ, সিগারেটের ধুঁয়া, গানের ধ্বনি, শারঙ্গের সুর, ঘুঙুরের শব্দ, তব্‌লার চাঁটি। কিন্তু আমি যেন একটা অপরিচিত লোকে আসিয়া পৌঁছিলাম। অনেক বার এই প্রমোদে মন ভাসাইয়া আনন্দ করিয়াছি। সেদিন কে যেন আমার মনের ভিতর থেকে আমায় ধরিয়া রাখিয়াছিল। মনে হইতেছিল এ সবই আমার নূতন, অপরিচিত। আমাকে জোর করিয়া এই নূতন অপরিচিত লোকে টানিয়া আনিয়াছে। সেখানে আমার অনেক পরিচিত লোক ছিল—বিডন ষ্ট্রীটের সুশীলা, হাতি বাগানের সুরী, পুঁতুল কিরণ, বেড়াল হরি, এই রকম অনেক ;—কিন্তু সে দিন যেন হঠাৎ মনে হইতে লাগিল ইহাদের কাহাকেও আমি চিনি না।

ইহাদের একটু তফাতে, এক কোণে বসিয়াছিল, "ডালিম"। এক-জন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ও মেয়েটীকে আগে কখনও দেখি নাই। সে বলিল "বাস্ ওকে জান না? ও যে ডালিম, সহর মাত্ করেছে, অনেক কাপ্তেন ভাসিয়েছে"। আমি বলিলাম "কাপ্তেন ভাসানর মত চেহারা ত ওর নয়। ও যে এক কোণে সরে বসে আছে।" বন্ধু বলিল "ওই ত ওর ঢং, ও অমনি করে' লোক ধরে"। আমার মন তাহা মানিতে চাহিল না। আমি কিছু না বলিয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। সেও আমায় দেখিতেছিল। বহুবার চোখে চোখে মিলিয়া গেল। আমি কি দেখিলাম—তাহার চাহনীতে কি ছিল—আমি কেমন করিয়া বলিব—আমি যে নিজেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছিলাম না। আমার মনে হইল সেই আমোদ-প্রমোদের সঙ্গে তার প্রাণের যোগ নাই। তার চোখ দুটী যেন আর কিসের খোঁজ করিতেছে। আমার প্রাণে কি হইতেছিল, তাহা ত বুঝাইয়া বলিতে পারি না। আমার ভিতর থেকে কে যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। ইচ্ছা হইল উহাকে বুকের ভিতর টানিয়া লই।

এমন সময় কে বলিল "ডালিম, একটা গাও"। আর একজন বলিল "ডালিম ভাল গাইতে পারে না"। আমি তাহার দিকে চাহি-লাম। সে বুঝিল, বলিল—"আমি ভাল গাইতে পারি না"। আমি বলিলাম "গাও না"? সে একটু সরিয়া আমার সামনে আসিয়া গান ধরিল। আমি সে রকম গান কখনও শুনি নাই। সেগানে সুরের কেরামতি ছিল না, তালের বাহাদুরী ছিল না; কিন্তু সেগানে যাহা ছিল, তাহা আর কখনও কোন গানে পাই নাই। মনে হইল ওই গানের জন্যই আমার সমস্ত মনটা অপেক্ষা করিয়াছিল। চোখের জলে ভেজা ভেজা সেই সুর, সুরের মধ্যে গানের কথাগুলি যেন নয়নপল্লবে অশ্রুবিন্দুর মত জ্বলিতেছিল। সেই সুরের প্রত্যেক স্বর, সেই গানের প্রত্যেক কথা আজও আমার প্রাণপল্লবে বিন্দু বিন্দু অশ্রুর ন্যায় ঝরিতেছে। ডালিম গাহিতেছিল :—

"কেমন করে মনেরা কথা কইব কাণে কাণে।
প্রাণ যে আমার ছিঁড়ে গেছে কাহার কঠিন টানে।
আজি আমি ঝরা ফুল, পড়ি তোমার পায়,
গন্ধ টুকু রেখে বঁধু হিয়ার হিয়ায়।
প্রাণের পাতে ফুলের মত
রাখব তোমায় অবিরত
তফাত্ থেকে দেখ্‌ব শুধু, রাখ্‌ব প্রাণে প্রাণে;
প্রাণ যে আমার ছিঁড়ে গেছে, কাহার কঠিন টানে॥"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি কখনও গান শিখেছিলে? সে বলিল "না, ওস্তাদের কাছে কখনও শিখি নাই।" আমি বলিলাম—আমি এমন গান কখনও শুনি নাই। তুমি কোথায় থাক? সে কোন কথা বলিল না। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—এই গানটী আমাকে একলা একদিন শুনাইবে? সে কোন উত্তর দিল না। আমি বলিলাম—এসব তোমার ভাল লাগে? তাহার চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল, কোন কথা বলিল না।

আমার বন্ধুদের তখন প্রায় সকলেরই মত্ত অবস্থা। এক উঠিয়া টলিতে টলিতে ইলেক্‌ট্রিক্ বাতিগুলি সব নিবাইয়া দিল।

আমি সেই অন্ধকারে ডালিমকে বুকে টানিয়া লইলাম। ৫ কিছু বলিল না। তার পর,—তার হাত ধরিয়া উঠাইলাম। আমিও দাঁড়াইলাম। তাহাকে আস্তে আস্তে বলিলাম—আমার সঙ্গে চল। সে আমার হাত ধরিল, আমার সঙ্গে চলিল।

কোথায় যাইব মনে মনে কিছুই ঠিক করি নাই। সিঁড়ি দিয়া নামিলাম। তার পর একটা ঘরের ভিতর দিয়া সেই লতামণ্ডপে গেলাম। তখন চাঁদের আলো আরও ম্লান মনে হইতেছিল। পুকুরের উপর একটু উজ্জ্বল ছায়া মাত্র পড়িয়াছে। বাতাস বন্ধ। ফুলের গন্ধ থামিয়া গিয়াছে। মনে হইল আকাশে যেন একটু মেঘ উঠি

ছে। সেই উজ্জ্বল অন্ধকারে একখানা বেঞ্চির উপর তাহাকে বসাই-
াম। আমার সর্ব্ব শরীর তখন অবশ হইয়া আসিতেছিল। বুকের
ভিতর ধপ্ ধপ্ করিতেছিল। আমিও তাহার পাশে বসিলাম। আমি
াহার হাত দুটী ধরিয়া বলিলাম—ডালিম, আমার তোমাকে বড়
ভাল লাগে। আমার ত এমন কখনও হয় নাই। সে বলিল—"ও
কথা ত সবাই বলে, মনে করিয়াছিলাম তুমি ওকথা বলিবে না।"
আমি বলিলাম—তুমি ত আমাকে চেন না। তাহার একখানি হাত
আমার বুকের উপর দিলাম। সে বলিল,—"তোমার কি হইয়াছে?"
আমি বলিলাম—"জানি না। ইচ্ছা হয় তোমাকে লইয়া কোথাও
পালাইয়া যাই। এত দিনের জীবনযাপন সবই মিথ্যা মনে হই-
তেছে"। সে আরও একটু আমার কাছে সরিয়া আসিল। আমার
বুকের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিল। অনেকক্ষণ কাঁদিল। আমারও
চোখে জল আসিয়াছিল, কোন কথা বলিতে পারি নাই। সে
যতই কাঁদিতে লাগিল, ততই তাহাকে বুকে চাপিতে লাগিলাম।
মনে হইল ইহাকে কোথায় রাখি, কেমন করিয়া শান্ত করি।
ক নিমেষে আমার সংসারের সকল সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেল। নিশী-
স্বপ্ন যেমন প্রভাতে এক নিমেষে মিলাইয়া যায়, আমার জীব-
সকল স্মৃতি, সংসারের সকল বন্ধন, সকল ঘটনা এক মুহূর্ত্তে
থায় মিলাইয়া গেল! একি সেই আমি? আমার মনে হইতে
াগিল আমি যেন কোন অপরিচিত ব্যক্তি, এই মাত্র এক নূতন
জগতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। সে অবস্থা সুখের কি দুঃখের আমি
আজ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিতেছি না। তাহাকে কেবল বুকে চাপিতে
লাগিলাম। কথা বলিবার শক্তি ছিল না। মনে মনে বলিতে লাগি-
াম—হে আমার ব্যথিত, পীড়িত! এস তোমার চোখের জল
ছাইয়া দি, তোমাকে বুকের ভিতর রাখিয়া দি, তুমি আর বাহিরে
কিও না—আমার বুকের ভিতর ফুটিয়া উঠ। আমিও তোমাকে
 করিয়া জীবন সার্থক করি। কতক্ষণ পরে সে একটু শান্ত

হইয়া উঠিয়া বসিল। বলিল—"আমি মনে করিয়াছিলাম তোমার সঙ্গে আসিব না। কে যেন আমার বুকের ভিতর থেকে বলিল যাও, তাই আমি আসিলাম। তুমি আমার কথা শুনিতে চাও? আমি মনে করিয়াছিলাম বলিব না, কিন্তু কে যেন আমার প্রাণের ভিতর হইতে বলাইতেছে। শুনিবে?" আমি বলিলাম—শুনিব; শুনিবার জন্যই তোমাকে এখানে আড়াল করিয়া আনিয়াছি। সে তাহার জীবন-কাহিনী বলিতে লাগিল, আমি শুনিতে লাগিলাম। সেই কণ্ঠস্বর আজও আমার প্রাণে জাগিয়া আছে। তাহার প্রত্যেক কথা আমার প্রাণে ব্যথার মত বাজিতে লাগিল,—আজও বাজিতেছে!

সে বলিল :—আমি শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন। কুলীন, ব্রাহ্মণের মেয়ে, মামার বাড়ীতে প্রতিপালিত। মামা নেশা করিতেন। দিবানিশি সুরামত্ত, তাহার কাছে থেকে কখন ভাল ব্যবহার পাই নাই। মামী আমাকে একটা বোঝা মনে করিত, তার মুখে কটূক্তি ছাড়া মিষ্টি কথা কখনও শুনি নাই। আমার মামাত ভাই আমাকে ভালবাসিতেন। তাঁহার কাছে লেখা পড়া শিখিয়াছিলাম। কিন্তু আমার যখন বার বৎসর বয়স তখন তিনি মারা যান। তারপর চারি বৎসর পর্য্যন্ত সে বাড়ীতে যে কি যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি তাহা তোমার না শুনাই ভাল। আমার ষোল বৎসর বয়সে বিবাহ হইল। আমার স্বামীর বয়স তখন পঞ্চাশ বৎসরের উপর। তার পর চা'র বৎসর শ্বশুরবাড়ীতে ছিলাম। এই চা'র বৎসরের মধ্যে আমা স্বামীর সঙ্গে বোধ হয় ছয় সাত দিনের বেশী দেখা হয় নাই তিনি বিদেশে চাকুরী করিতেন। কখন কখন দুএক দিনের জন্য বাড়ী আসিতেন। বাড়ীতে আসিলেও বাহির বাড়ীতেই থাকিতেন আমার সঙ্গে দুই এক বার দেখা হইয়াছিল, কখনও কথাবার্তা হ নাই। তাঁহার আগে দুইবার বিবাহ হইয়াছিল, চা'র পাঁচটী ছেলে মেয়ে ছিল। আমার শাশুড়ী তাঁহার বিমাতা। আমার ক

কহিবার কেহ ছিল না। ছেলেপিলেগুলিকে দেখিতে হইত। কাঁদিলেই শাশুড়ীর কাছ থেকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি শুনিতাম। কখনও কখনও মারও খাইয়াছি। বাড়ীতে ঝি ছিল না, সমস্ত কাজই আমাকে করিতে হইত। ঘরের মেজে পরিষ্কার করা থেকে আরম্ভ করিয়া—রাঁধাবাড়া, ছেলেপিলেদের দেখা ও দুইবার খাওয়ার পর বাসনগুলি—বাড়ীর কাছে নদী, সেই নদীতে—মাজিয়া আনিতে হইত। আমার মনে হয় না যে এই চা'র বৎসরের মধ্যে কখনও চোখের জল না ফেলিয়া ভাত খাইতে পারিয়াছি। যতই দিন যাইতে লাগিল আমার যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিল। আমি পাগলের মত হইয়া গেলাম। আমার কাছে কয়েকখানি বাঙ্গালা বই ছিল, মাঝে মাঝে রাত্রে সবাই ঘুমাইলে একটা প্রদীপ জ্বালিয়া পড়িতাম। আমার শাশুড়ীর তাহা সহিল না। একদিন সেই বইগুলি পোড়াইয়া ফেলিলেন। আমারও আর সহ্য হইল না। সেই দিনই মনে স্থির করিলাম এ বাড়ীতে আর থাকিব না। পাড়ার একটা ছেলে—আমি যখন ঘাটে বাসন মাজিতাম, আমার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিত, আর আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত, কিছু বলিত না, আমিও কিছু বলিতাম না। সেদিন সন্ধ্যার সময় বাসন মাজিতে ঘাটে গেলাম, চাঁদের আলো ছিল, বাতি লইয়া যাই নাই। দেখিলাম সে ঠিক সেইখানে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়াই সনগুলি নদীতে ফেলিয়া দিলাম। তাহাকে বলিলাম—আমাকে মামার ড়ী পৌঁছাইয়া দিতে পার? সে বলিল—কত দূর? আমি গ্রামের নাম লাম। সে বলিল—নৌকায় যাইতে তিন চার ঘণ্টা লাগিবে। আমি লাম—যতক্ষণই লাগে আমাকে লইয়া যাও। এই বলিয়া তাহার পায় ছড়াইয়া পড়িলাম। সে বলিল—আচ্ছা তুমি এইখানে বস', আমি কা ঠিক করিয়া আসি। সে নৌকা লইয়া আসিল, আমি নৌকায় ঠলাম। ভাবিলাম এইবার যমের বাড়ী ছাড়িয়া মামার বাড়ী যাইছি। যতক্ষণ নৌকায় ছিলাম, সে ঠিক সেই রকম করিয়া আমার

দিকে চাহিয়াছিল, কোন কথা বলে নাই; শুধু চাহিয়াছিল, আমার মনে হইতেছিল তাহার চোখ দুটী যেন আমাকে গিলিয়া ফেলিবে। আমি ভয়ে ভয়ে চুপ করিয়াছিলাম।

যখন মামার বাড়ী গিয়া পৌঁছিলাম তখন বেশ রাত্রি, মামা অজ্ঞান হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, আর সকলেই শুইয়াছে। অনেক ডাকাডাকির পর মামী উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। আমাকে দেখিয়া যেন একটু শিহরিয়া উঠিলেন। আমি তাঁহার পায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম, বলিলাম আমি পালাইয়া আসিয়াছি, আমি সেখানে আর যাব না। "আমি তোমার দাসী হইয়া থাকিব, আমাকে রক্ষা কর, তোমার বাড়ীতে একটু স্থান দাও"। মামী কর্কশস্বরে বলিলেন "পালিয়ে এসেছিস্—কার সঙ্গে ?" আমি সে কথার অর্থ তখন ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। আমি সেই ছেলেটাকে দেখাইয়া বলিলাম "এর সঙ্গে"। মামী বলিলেন—"এ কে ?" আমি বলিলাম—"জানি না"। মামী বলিলেন, "আমার বাড়ীতে তোমার স্থান হ'বে না"। আমি কোথায় যাব! মামী বলিলেন 'গোল্লায়', বলিয়াই দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি পাগলের মত সেই দরজায় ধাক্কা মারিতে লাগিলাম। কেহ সাড়া দিল না। তখন সে আমার পিছনেই দাঁড়াইয়াছিল, সরিয়া আসিয়া আমার হাত ধরিয়া আমাকে ফিরাইয়া লইয়া চলিল।

আমি চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছিলাম। কোথা যাব ? কোথা যাব ? এই কথাই বারে বারে মনে উঠিতেছিল। কিন্তু এই প্রশ্নের কোন উত্তরই পাইলাম না। পুতুলের মত সে যেদিকে লইয়া গেল সেদিকেই গেলাম।

আবার সেই নৌকা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কোথা যাইবে ? সে বলিল 'কল্‌কাতায়,'। তখন সেই কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম। বিদ্যুতের মত আমার মনে চম্‌কাইয়া গেল। আমি চীৎকার করিয়া তাহার পায় পড়িলাম। কাঁদিয়া বলিলাম—আমাকে রক্ষা কর

আবার আমাকে শ্বশুর বাড়ী লইয়া চল। সে কিছুক্ষণ চুপ্ করিয়া রহিল, তারপর বলিল "আচ্ছা"। কিন্তু ফের সেই চাহনি, আমি ভয়ে, অপমানে, দুঃখে, লজ্জায় একেবারে মরিয়া গেলাম।

ভোর হইতে না হইতে নৌকা ঘাটে লাগিল। আমি দৌড়িয়া শ্বশুর বাড়ীর দিকে চলিলাম। সে বাধা দিল না, কিন্তু আমার পিছনে পিছনে আসিল, আমি কিছু না বলিয়া দরজায় আঘাত করিতে লাগিলাম। আমার শাশুড়ী উঠিয়া আসিয়া দরজা খুলিল, আমাকে দেখিয়াই সজোরে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। আমি চীৎকার করিয়া 'মা, মা' বলিয়া ডাকিলাম, আর কোন সাড়াশব্দ পাইলাম না।

তখন আর কাঁদিতে পারিলাম না, চোখে আর জল ছিল না। মামীর কথা মনে পড়িল—"গোল্লায় যাও"। আমি ফিরিলাম, দেখিলাম সে দাঁড়াইয়া আছে, আর ঠিক তেম্‌নি করিয়া চাহিয়া আছে। আমি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম, বলিলাম—"আমি গোল্লায় যাব, যেথানে ইচ্ছা লইয়া যাও"।

তখন নিশ্চয়ই সূর্য্য উঠিয়াছে, কিন্তু আমার চোখে ঘোর অন্ধকার —মনে হইল যেন সেই ঘোর অন্ধকারে এক ভীষণাকৃতি কাপালিক আমার হাত ধরিয়া কোন অদৃশ্য বলিদান-মন্দিরের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

তার পর?

তার পর কলিকাতায় আসিলাম। শুনিলাম সে কোন জমিদারের ছেলে। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া দু'জনে থাকিলাম। সাত দিন সে আমার গায় গায় লাগিয়াছিল। তাহার সেই চাহনির অর্থ সেই কয়দিনে বেশ ভাল করিয়া বুঝিলাম। আট দিনের দিন আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।

তার পর?

এখন আমি কল্‌কাতার ডালিম। আমার সুখের শেষ নাই। সহরের বড় বড় লোক আমার পায়ের তলায় গড়াগড়ি যায়।

আমার বাড়ীতে সাজ সজ্জার অভাব নাই, সোনার খাট, হীরার গহনা। বাড়ীতে ইলেক্‌ট্রিক্ বাতি, ইলেক্‌ট্রিক্ পাখা, দাসদাসীর অন্ত নাই, আলমারি ভরা কাপড়, বাক্স ভরা টাকা।

"আমি কল্‌কাতার ডালিম, কিন্তু"—কিন্তু বলিয়াই কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। দু'হাত দিয়া বুক চাপিয়া ধরিল। তখন জ্যোৎস্নার লেশ মাত্র নাই। সেই লতা-মণ্ডপ গাঢ় অন্ধকারে ভরা। তাহার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছিল। আমি সেই অন্ধকারে তার শব্দ শুনিতে পাইতেছিলাম। আর আমার অন্তরে এক অসীম বেদনা অনুভব করিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে সে বলিল—"কিন্তু আমি যেন অঙ্গারের মত জ্বলিতেছি, বুক যে জ্বলিয়া জ্বলিয়া পুড়িতেছে, তাহা কি কেহ দেখিতে পায়?"

আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। বোধ হয় কাঁদিতেছিল। তার পর বলিল "তোমার আমাকে ভাল লাগিয়াছে? তোমার মত আর কারও সঙ্গে আমার এ জীবনে কখনও দেখা হয় নাই। কেন তোমাকে আগে দেখিলাম না? আমি যখন নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলাম, তখন তুমি কোথায় ছিলে? এখন—এখন তোমাকে ত কিছু দিবার নাই"।

এই বলিয়া সে আমার বুকে ঢলিয়া পড়িল, শিশুর মত কাঁদিতে লাগিল, আমি বলিলাম—আমি আর কিছু চাই না, আমি তোমাকেই চাই। এই বলিয়া দুইজনেই কাঁদিতে লাগিলাম। সেই অন্ধকারে তাহাকে বুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। পাগলের মত জ্ঞান-হারা হইয়া কাঁদিতেছিলাম। কতক্ষণ কাঁদিয়াছিলাম জানি না। আমি কি জাগিয়াছিলাম? মনে হইতেছিল আমি ডালিমকে লইয়া এই সংসারের বাহিরে এক অপূর্ব্ব নন্দন-কাননে বাস করিতেছি। আমি আর ডালিম,—সে জগতে আর কেহ নাই! চিরদিন তাহাকেই বুকে করিয়া রাখিয়াছি। প্রতি প্রভাতে তাহাকে নব নব ফুলে সাজাইয়াছি, প্রতি নিশাশেষে তাহাকে নব নব চুম্বনে জাগাইয়া দিয়াছি।

প্রাণের যে একটা মুক্ত আকাশ আছে, আর একটা অতি গভীর পাতাল আছে, সেদিন প্রথম অনুভব করিলাম। আমার হৃদয়ের সেই স্বর্গ ও সেই পাতাল পূর্ণ করিয়াছিল ডালিম—ডালিম!

এমন সময় উপরে কোলাহল শুনিলাম, চমকিয়া দেখিলাম ডালিম আমার কাছে নাই! আমি অস্থির হইয়া গেলাম, পাগলের মত ছুটা-ছুটী করিতে লাগিলাম। দৌড়িয়া উপরে গেলাম, দেখিলাম সেখানে ডালিম নাই। আমাকে দেখিয়া একজন বলিল "কি বাবা, একেবারে উধাও"। আমি তাহাকে গালি দিলাম। আবার ছুটিয়া নীচে আসিলাম। সেই বাগানে সকল স্থানে খুঁজিলাম। ডালিম ডালিম বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলাম। কোন সাড়াশব্দ পাইলাম না। ফটকে গেলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম "কোই বিবি চলা গিয়া?" এক জন গাড়োওয়ান বলিল "হাঁ বাবু, এক বিবি আভি চলা গিয়া"। আবার দৌড়িয়া উপরে গেলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম "ডালিম কোথায় থাকে?" এবার আর কেহ রসিকতা করিল না। ঠিকানা জানিয়া লইয়া আবার ফটকে দৌড়িয়া আসিলাম। একখানা মোটর-কার করিয়া তাহার বাড়ী গেলাম। শুনিলাম, ডালিম আসে নাই। কতক্ষণ সেখানে ছিলাম জানি না, ডালিমের দেখা পাইলাম না। আবার বাগানে গেলাম, আবার খুঁজিলাম, কিন্তু তাহাকে আর পাইলাম না।

সে রাত্রে ঘুমাই নাই। পাগলের মত ছুটাছুটী করিলাম। পরদিন প্রভাতে আবার ডালিমের বাড়ী গেলাম। ঝী বলিল, সে শেষরাত্রে এসেছিল, আবার ভোর না হ'তেই চলে গেছে। একখানা চিঠি রেখে গেছে, তাহাকে বলে গেছে—সকালে একজন বাবু খোঁজ করতে আসবে, তাঁকে এই চিঠিখানা দিস্।

আমি সেই চিঠিখানি লইলাম। খুলিতে খুলিতে আমার হাত কাঁপিতে লাগিল, চিঠিখানি পড়িলাম :—

তুমি আমাকে খুঁজিতে আসিবে জানি, কিন্তু আমাকে আর খুঁজিও না। আমাকে আর কোথাও দেখিতে পাইবে না। মনে করিও

আমি মরিয়া গিয়াছি। আমি মরি নাই—মরিতে পারিব না! তুমি আমাকে যাহা দিয়াছ, আমি এ জীবনে কখনও পাই নাই। তাহারি গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাই। অনেক দুঃখ সহিয়াছি, সংসারে যাকে সুখ বলে তাহাও পাইয়াছি, কিন্তু কাল রাত্রে যে সত্য প্রাণের পরশ পাইয়াছি, তাহা কখনও পাই নাই। তাহারি স্মৃতিটুকু প্রাণে প্রদীপের মত জ্বালাইয়া রাখিতে চাই। যাহা পাইয়াছি তাহা আর হারাইতে চাই না।

তুমি আমাকে খুঁজিও না। প্রাণ সর্ব্বস্ব! আমি বড় দুঃখী, তুমি কাঁদিয়া আমার দুঃখ বাড়াইও না। এ জন্মে হইল না, জন্মান্তরে যেন তোমার দেখা পাই!

ডালিম

শক ও শকাব্দ

প্রাচীনকালে শক জাতি ভারতবর্ষে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। ভারত-ইতিহাসের যে যুগকে আমরা আজকাল পৌরাণিক (Traditional) যুগ বলিয়া থাকি, সেই যুগে শকজাতির প্রতিষ্ঠার কথা মহাভারত প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক যুগে শকজাতির বৃত্তান্ত অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুরাণ ও জৈনগ্রন্থ প্রভৃতি হইতে জানিতে পারা যায়। এই সকল গ্রন্থেও যে সমুদয় কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই যে সর্ব্বাংশে সত্য, এরূপ অনুমান করাও সঙ্গত নহে। কিন্তু শকজাতি যে ঐতিহাসিক যুগে ভারতবর্ষে বিশেষ ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিল, পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থসকল হইতে নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারা যায়।

শকজাতি কর্তৃক স্থাপিত 'শকাব্দ' নামক সুপ্রসিদ্ধ অব্দই অতীত কালে ভারতবর্ষে শকজাতির প্রতিষ্ঠার বিশিষ্ট প্রমাণ। খৃষ্ট জন্মের ৭৮ বৎসর পরে এই অব্দ প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং এখন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বহুস্থানে ইহার প্রচলন আছে। কোন কোন প্রদেশে ইহা 'শালিবাহন শক' নামে পরিচিত এবং এই কারণে এদেশের সাধারণ লোকের ধারণা যে, দাক্ষিণাত্যের খ্যাতনামা শালিবাহন নৃপতি কর্তৃকই এই অব্দ প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তিও এইরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকেন, এবং কোন কোন বিশিষ্ট বাঙ্গালা গ্রন্থেও এইরূপ উল্লেখ দেখিয়াছি। কিন্তু বস্তুতঃ এ ধারণাটা নিতান্তই অমূলক। 'শকাব্দ' এই নামটিই এই অব্দের প্রকৃত উৎপত্তির পরিচায়ক। কিন্তু এ বিষয়ে আরও নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই অব্দের পঞ্চশততম বৎসরে উৎকীর্ণ বাদামীগুহাস্থিত শিলালিপিতেই প্রথমে এই অব্দের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। "শক রাজার অভিষেকের পঞ্চশত বৎসর পরে",—শিলালিপির এই সুস্পষ্ট বাক্য

পড়িয়া শকাব্দের উৎপত্তি বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

উপরোক্ত প্রমাণ ছাড়াও ভারতবর্ষে শকজাতির প্রতিষ্ঠার বিশিষ্ট প্রমাণ স্বরূপ দুইখানি শিলালিপির উল্লেখ করিতে পারা যায়।

১৮৮৭ খৃঃ অব্দে ডাক্তার বার্গেস্ মথুরার ভূগর্ভে একখণ্ড প্রস্তর প্রাপ্ত হন। তদুপরি উৎকীর্ণ লিপিতে নিম্নলিখিত কথা কয়েকটি খোদিত রহিয়াছে

১ম পংক্তি "(ন) মো অরহতো বর্দ্ধমানস্য গোতিপুত্রস পোঠয়সক

২য় পংক্তি কালবালস

৩য় পংক্তি (ভার্য্যায়ে) কোশিকিয়ে সিমিত্রায়ে (শিবমিত্রায়ে ?) অয়াগপটো প্রতি (প্রতিষ্ঠাপিত)

ডাক্তার বুলার "এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকার" প্রথম সংখ্যার ৩৯৬ পৃষ্ঠায় ইহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল :—

"অরহৎ বর্দ্ধমানকে নমস্কার পূর্ব্বক, পোঠয় ও শকজাতির পক্ষে কালসর্পস্বরূপ গৌপ্তিপুত্রের পত্নী, কৌশিক গোত্র সমুদ্ভূতা, শিবমিত্রা কর্ত্তৃক 'অয়াসপট' * প্রতিষ্ঠিত হইল।

ইহার মধ্যে গৌপ্তিপুত্রের বিশেষণটি আমাদের পক্ষে অনুধাবনার বিষয়। তাঁহাকে "পোঠয় ও শকজাতির পক্ষে কালসর্পস্বরূপ" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে গৌপ্তিপুত্র পোঠয় (মহাভারতোক্ত প্রোষ্ঠ) ও শকজাতিকে যুদ্ধে পরাভব করিয়াছিলেন, ইহাই উক্ত বিশেষণটিতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। "বৈরী মত্তেভ সিংহ" প্রভৃতি বিশেষণ ইহার সঙ্গে তুলনীয়। গৌপ্তি-পুত্রের বিশেষণটি হইতে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, এককালে শকজাতি ভারতবর্ষে আধিপত্য লাভ করিয়াছিল।

---

* ভাস্কর্য্য-কলাকুশলসম্পন্ন প্রস্তরখণ্ডবিশেষ। ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ প্রণীত "এণ্টিকুইটিস্ অফ্ মথুরা" নামক গ্রন্থে কয়েকখানি অয়াসপটের প্রতিকৃতি দেওয়া আছে।

দ্বিতীয় শিলালিপিখানি মথুরায় প্রাপ্ত 'সিংহ' আকৃতি সম্পন্ন স্তম্ভ-চূড়ার খোদিত। ইহার আবিষ্কর্ত্তা পণ্ডিত ভগবানলাল ইন্দ্রজী এই লিপির নিম্নলিখিতরূপ পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

"সর্ব্বস সকস্তনস পুয়ায়ে"
অর্থ,—সমগ্র সকস্থানের পুণ্যের নিমিত্ত।

পণ্ডিতজীর মতে সকস্থানের অর্থ শকগণের বাসভূমি। শকস্থান নামক সুপ্রসিদ্ধ দেশ বর্ত্তমান কালের 'সিস্টান' প্রদেশ। কারণ ইসি-ডোর নামক ১ম শতাব্দীর জনৈক লেখকের বর্ণনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ঐ সময়ে বর্ত্তমানে যেখানে সিস্টান প্রদেশ তথায় বহুসংখ্যক শকজাতীয় লোক বাস করিতেন এবং তদনুসারে উক্তস্থান শকস্থান নামে সাধারণের নিকট সুপরিচিত ছিল। ইহাও সহজেই অনুমিত হয় যে সিস্টান শকস্থানেরই অপভ্রংশ।

উপরোক্ত শিলালিপিটির মর্ম্ম এক্ষণে সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে বোধ হয় যে, কোন বৌদ্ধ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ঐ স্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল এবং মন্দি-রের প্রতিষ্ঠাকারীগণ স্তম্ভচূড়ায় স্বীয় মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তৎকালে প্রচলিত নিয়মানুসারে যাহারা মন্দিরাদি স্থাপনা করিতেন অথবা তথায় দানাদি করিতেন, তাঁহারা স্বীয় নাম, এবং কাহার পুণ্যার্থে উক্ত দানক্রিয়া সাধিত হইল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ খোদিত করিয়া রাখিতেন। সুতরাং একথা সহজেই উপলব্ধি হয় যে শক-জাতীয় কোন ব্যক্তি উক্ত বৌদ্ধ মন্দির স্থাপনা বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, এবং তাঁহার কর্ম্মের ফলস্বরূপ তিনি যেটুকু পুণ্যের প্রত্যাশা করিতে পারিতেন তাহা সুদূরস্থিত স্বদেশের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়াছেন। সাধারণতঃ লোকে নিজের বা নিজের আত্মীয় স্বজনের—পিতামাতা পুত্র ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতির পুণ্য কামনা করিয়া থাকে—কিন্তু এই স্বদেশপ্রাণ ব্যক্তি তৎসমুদায় উপেক্ষা করিয়া তাঁহার

সমগ্র পুণ্যফল নিজের দেশকে অর্পণ করিয়াছেন, এবং প্রস্তরগাত্রে তাঁহার স্বদেশবাৎসল্য চিরদিনের নিমিত্ত সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছেন। এই হিসাবে এই সংক্ষিপ্ত লিপিখানির অমূল্য হইলেও, আমাদের নিকট ইহার বিশিষ্ট মূল্য এই যে ইহা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন করে যে এককালে শকজাতি মথুরায় প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল।*

এ পর্য্যন্ত যাহা লিখিত হইল তাহার উদ্দেশ্য এই কথাটি প্রতিপন্ন করা যে ভারতবর্ষে শকজাতির প্রাধান্যবিস্তার কেবল মাত্র আমাদের দেশের পুরাণ-কথা (tradition) নহে, তৎসম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণেরও অভাব নাই। এত বিস্তার করিয়া লিখিবার কারণ এই যে বর্ত্তমানে কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ উক্ত পুরাণকথার সত্যতার বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে শকজাতি কোনকালেই আর্য্যাবর্ত্তে প্রাধান্যলাভ করে নাই এবং শকাব্দাও তাহাদের কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; শকাব্দ নামে যে বর্ষগণনা অধুনা প্রচলিত তাহা হিন্দু জ্যোতিষীগণের কারসাজিমাত্র। ইহার অনুরূপ আর একটি যুক্তি ফার্গুসণ সাহেব কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত হইয়াছিল।

তাহার মতে বিক্রম-সংবৎ অব্দ রাজা বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক স্থাপিত হয় নাই (কারণ বিক্রমাদিত্য নামে কোন রাজাই এদেশে ছিল না) এবং ৫৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দেও তাহার গণনা আরম্ভ হয় নাই। ৫৪৩ খৃঃ অব্দে এই অব্দের গণনা আরম্ভ হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের 'ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণগণ' ইহাকে প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত ইহার বর্ষগণনা ছয় শত বৎসর পশ্চাৎপদ করিয়া দিয়াছিল। ফার্গুসণ সাহেবের সিদ্ধান্তের শোচনীয় পরিণাম সকলেই অবগত আছেন। আমাদের ভরসা আছে ফ্লীট সাহেব উদ্ভাবিত অপর সিদ্ধান্তের পরিণামও তাহাই হইবে।

---

* এই দুইখানি শিলালিপির প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। এই প্রবন্ধ সাধারণ পাঠকের জন্য লিখিত বিশেষজ্ঞের জন্য নহে, সুতরাং এবিষয়ে কোন বাদানুবাদ না করিয়া আমাদের মতে যে অর্থটি প্রকৃষ্ট তাহাই মাত্র লিপিবদ্ধ করিলাম।

এ বিষয়ে আরও একটু রহস্য আছে। ফার্গুসন সাহেব বিক্রমাদিত্য ও তৎপ্রতিষ্ঠিত অব্দের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু শকাব্দ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার মতে বাস্তবিক ৭৮ খৃঃ অব্দেই ইহার আরম্ভ এবং শকরাজা কর্ত্তৃকই ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। এই শকরাজা কনিষ্ক। ফ্লীট ইহার ঠিক বিপরীত মত পোষণ করেন। শকগণ কর্ত্তৃক শকাব্দ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ইহা তিনি অস্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহার মতে বিক্রমসংবৎ বাস্তবিকই খৃঃ পূঃ ৫৭ অব্দে বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এবং এই বিক্রমাদিত্য কনিষ্ক। ফার্গুসণের মতে বিক্রমসংবৎ ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণগণের ছলনামাত্র, কিন্তু শকাব্দই প্রাচীন ভারতের প্রকৃত অব্দ। ফ্লীটের মতে শকাব্দ জ্যোতিষীগণের কারসাজি মাত্র, পরন্তু বিক্রমসংবৎই আর্য্যাবর্ত্তের ইতিহাস-বিখ্যাত অব্দ (the historic era of Northern India).

আমরা দেখিয়াছি শকজাতি এককালে ভারতবর্ষে প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল। তাহাদের আদি বাসস্থান কোথায়, কবে কিরূপে তাহারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিল, এখন তারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব।

চীনদেশীয় গ্রন্থ ও গ্রীক লেখকদিগের বিবরণ হইতে জানা যায় যে খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতাব্দীতে শকজাতি জাক্সারটেস্ (সিরদরিয়া) নদীর তীরে বাস করিত। ক্রমে বংশবৃদ্ধি হইলে তাহারা সিরদরিয়া ও অকসাস্ (আমুদরিয়া) নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ অধিকার করে। এই সময়ের মধ্য এসিয়ার অন্তর্গত হিয়ংনু নামক জাতি পরাক্রান্ত হইয়া উঠে এবং পার্শ্ববর্ত্তী ইয়ু-চি জাতিকে পরাজিত করিয়া তাহাদের রাজ্য অধিকার করে। পরাজিত ইয়ু-চিগণ পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং ক্রমে শকরাজ্য অধিকার করিয়া তথায় বসবাস করে। এইরূপে শকগণ তাহাদের আদিম বাসস্থান হইতে তাড়িত হয়। এই ঘটনা খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে ঘটিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

শকগণ পরাভূত হইয়া পশ্চিমদিকে প্রস্থান করে এবং অমুদরিয়া

পার হইয়া বক্ট্রিয়া প্রদেশ অধিকার করে। তৎকালে এই প্রদেশে গ্রীকগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ আলেকজাণ্ডার ভারত অভিযানের পূর্ব্বে এই বক্ট্রিয়া প্রদেশ অধিকার করেন, এবং সেই সময় হইতেই গ্রীকগণ এই প্রদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন। এই গ্রীকবংশের অন্যতম রাজা হেলিওক্লিসের রাজত্বকালে শকগণ বক্ট্রিয়া প্রদেশ অধিকার করে এবং গ্রীকরাজগণ কাবুলে ও ভারতবর্ষে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আনুমানিক খৃঃ পূঃ ১৩০ অব্দে এই ঘটনা ঘটে।

বক্ট্রিয়া প্রদেশের যে অংশ আমুদরিয়ার দক্ষিণে তাহাই মাত্র শকগণের অধিকারভুক্ত হয়। আমুদরিয়ার উত্তরে তাহাদের পরম শত্রু ইয়ু-চিগণ স্বীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে। চ্যাং-ফিয়েন নামক এক-জন চীনদেশীয় দূত এই সময়ে উক্ত প্রদেশে আগমন করেন এবং তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে আমরা এই সময়ের ঘটনা ও অবস্থা কতক কতক জানিতে পারি।

শকগণ বক্ট্রিয়া প্রদেশ অধিকার করিয়াই নিরস্ত থাকে নাই। অতঃ-পর তাহারা পার্থিয়া * রাজ্য আক্রমণ করে। এই পার্থিয়া দেশের ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায় যে সুপ্রসিদ্ধ মিথ্রাডেটিসের মৃত্যুর পর শকগণের আক্রমণে পার্থিয়া রাজ্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে। রাজা দ্বিতীয় ফ্রায়াটেস্ শকগণের সহিত যুদ্ধে নিহত হন এবং পরবর্ত্তী রাজা প্রথম আর্ত্তবেনাসেরও ঐরূপ শোচনীয় পরিণাম ঘটে। অবশেষে দ্বিতীয় মিথ্রাডেটিস তুমুল সংগ্রামের পর শকগণকে পরা-ভূত করেন।

এইরূপে শকগণ পার্থিয়া হইতে দূরীভূত হইল। বক্ট্রিয়া প্রদে-

---

* বর্ত্তমান কালের পারস্য ও তুর্কীস্থানের কিয়দংশ প্রাচীন পার্থিয়ান জাতির সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। পার্থিয়ার সম্রাটগণ প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন এবং বহুবর্ষ পর্য্যন্ত তাহারা পূর্ব্ববিখ্যাত রোম সাম্রাজ্যের সহিত প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন।

শেও তাহাদের অধিকার অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। যে ইয়ু-চি জাতি কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া, স্বদেশ ও স্বজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক, দীর্ঘ পথ ভ্রমণ ও বহুক্লেশের পর, অবশেষে তাহারা বক্ত্রিয়া প্রদেশে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল, সেই ইয়ু-চি জাতির পরাক্রমেই আবার তাহাদিগকে এই নূতন আশ্রয়ও পরিত্যাগ করিতে হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমুদরিয়ার দক্ষিণে শকগণ বাস করিত, এবং ইহার উত্তর ভূভাগ ইয়ু-চিগণের অধিকারভুক্ত ছিল। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান ছিল মাত্র একটি নদী, কিন্তু ক্রমে ইয়ু-চি জাতি এই ব্যবধান উল্লঙ্ঘন করিল, এবং শকগণের দুর্ভাগ্য আবার তাহাদিগকে নূতন আশ্রয় স্থান অনুসন্ধানে নিযুক্ত করিল। তাহাদের উত্তরে ও পূর্ব্বে ইয়ু-চি জাতি, সুতরাং এ দুই দিক এক প্রকার বন্ধ। পশ্চিমে পার্থিয়া রাজ্য সেখান হইতেও বহুকাল সংগ্রামের পর তাহারা পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে; বাকী এক দক্ষিণ দিক। নিরুপায় হইয়া শকগণ দক্ষিণ দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিল। বর্ত্তমান আফগানিস্থানের দক্ষিণাংশই সম্ভবতঃ শকগণের প্রথম উপনিবেশ হইয়াছিল, কারণ ইহার অন্তর্গত একটি প্রদেশ তাহাদের নামানুসারে শকস্থান নামে পরিচিত হইয়াছিল। এইরূপে ঘটনাচক্রের প্রভাবে এই শকজাতি মধ্য এশিয়া হইতে আগমন করিয়া ভারতবর্ষের সীমান্তপ্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল। খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল এই-রূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

এপর্য্যন্ত শকগণের সম্বন্ধে যে সমুদয় বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা চীনদেশীয় ইতিবৃত্ত হইতে সংগৃহীত। কিন্তু চীনদেশীয় গ্রন্থে শকজাতির ইতিবৃত্ত এইখানেই শেষ হইয়াছে। শকস্থানে উপনিবেশ স্থাপনের পরে শকদিগের জাতীয় জীবনে আর কি ঘটনা ঘটিয়া-ছিল, বিদেশীয় কোন গ্রন্থ হইতে তাহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস যেটুকু উদ্ধার হইয়াছে তাহাতে এই শকজাতির বিবরণ কতক জানিতে পারা যায়। এতদ্ব্যতীত

ভারতবর্ষের পুরাণ-কথাও তাহাদের কাহিনী সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে।

প্রথমতঃ ইতিহাসের দিক দিয়াই দেখা যাউক। তক্ষশিলা এবং তৎসন্নিহিত অপরাপর স্থানে কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এই সমুদায় এবং তক্ষশিলায় প্রাপ্ত দুইখানি শিলালিপির প্রামাণে আমরা পশ্চিম ভারতবর্ষের এক পরাক্রান্ত রাজবংশের পরিচয় পাই। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা (সম্ভবতঃ) মগ্ বা মগ। এই বংশের অপরাপর রাজার নাম অ্যাজেস্, অ্যাজিলাইসিস্, অ্যাজেস্ (দ্বিতীয়)। নাম প্রভৃতি দৃষ্টে এই রাজগণকে শক জাতীয় বলিয়া বোধ হয়, এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ প্রায় সকলেই ইহাদিগকে শকজাতীয় বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, যে শকজাতিকে আমরা শকস্থানে এবং তৎসন্নিহিত প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতে দেখিয়াছি তাহাদেরই একদল সিন্ধুনদ পার হইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ ও অধিকার করে। ঠিক কোন সময়ে মগ ভারতবর্ষে রাজ্যবিস্তার করেন, তাহা সঠিক জানা যায় না। সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মগ সিংহাসন আরোহণ করেন। কারণ মগের মুদ্রা হইতে জানিতে পারা যায় যে তিনি কান্দাহার প্রদেশের ভনোনিস্ নামক রাজার সমসাময়িক। এই ভনোনিস্ ও পার্থিয়ার রাজা ভনোনিস্ অভিন্ন ব্যক্তি কল্পনা করিতে পারি, কারণ কান্দাহার প্রদেশের প্রাপ্ত ভনোনিসের মুদ্রায় পার্থিয়ার রাজার পদবী ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং মুদ্রা দৃষ্টে জানা যায় যে যদিও কান্দাহার উক্ত ভনোনিসের অধীন ছিল, তথাপি ভনোনিস নিজে কান্দাহার শাসন করিতেন না, তাঁহার ভ্রাতা তথাকার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ওদিকে আবার ইসিডোর নামক লেখকের ইতিবৃত্ত হইতে জানিতে পারি যে প্রথম শতাব্দীতে কান্দাহার প্রদেশ পার্থিয়ার রাজার অধীন ছিল। পার্থিয়ার রাজগণ যে ভ্রাতা বা অন্য নিকট-আত্মীয়ের দ্বারা দূরস্থিত প্রদেশসমূহ শাসন করাইতেন তাহাও পার্থিয়ার ইতিহাস হইতে

জানিতে পারা যায়। এই সমুদয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় কান্দাহারে প্রাপ্ত মুদ্রার ভনোনিস্ ও পার্থিয়ার ভনোনিস্ অভিন্ন ব্যক্তি। পার্থিয়ায় ভনোনিস্ নামে দুইজনে রাজা ছিলেন। পূর্ব্বোল্লিখিত ভনোনিস্ ইহার মধ্যে কোন জন তাহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু দুইজনেই খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রাজত্ব করেন। সুতরাং ভনোনিসের সমসাময়িক তক্ষশিলার শকরাজা মগও খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর লোক এইরূপ অনুমান করিয়া লইতে পারি।

ভারতবর্ষের পুরাণ-কথায় শকজাতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কালকাচার্য্য নামে জৈনগুরুর জীবন কাহিনী বহু জৈনগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। ইহা "কালকাচার্য্য কথা" নামে সুপ্রসিদ্ধ। 'কালকাচার্য্য কথার' সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে একদা গুরু কালকাচার্য্য স্বীয় ভগিনীসহ উজ্জয়িনী নগরীতে উপস্থিত হন। উজ্জয়িনীর রাজা গর্দ্দভিল্ল কালকাচার্য্যের ভগিনীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করেন। কালকাচার্য্য ইহাতে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সিন্ধুনদ পার হইয়া শকরাজ্যে গমন করেন। এই রাজ্যে বহুসংখ্যক সামন্ত শক নরপতি বাস করিতেন—তাহারই একজনের আশ্রয়ে কালকাচার্য্য বাস করেন। ক্রমে তিনি এই নরপতির বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। অবশেষে কালকচার্য্য এই শকনরপতিকে ভারতবর্ষ আক্রমণের পরামর্শ দেন এবং নিজে পথ প্রদর্শক হইয়া তাহার সৈন্য উজ্জয়িনীতে লইয়া যাইবেন এইরূপ অঙ্গীকার করেন। উক্ত সামন্ত নরপতি এই প্রস্তাবে সম্মত হন এবং অপর কয়েকজন সামন্ত নরপতির সাহায্যে উজ্জয়িনী আক্রমণ ও অধিকার করেন। রাজা গর্দ্দভিল্ল নিহত হন, কিন্তু তাঁহার পুত্র বিক্রমাদিত্য নানাস্থানে ঘুরিয়া সৈন্য সংগ্রহ করতঃ চারিবৎসর পরে শকগণকে বিতাড়িত করিয়া পিতৃরাজ্য পুনরায় অধিকার করেন। এই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার মানসে বিক্রম-সংবৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিক্রমাদিত্য ও তাঁহার পুত্র-পৌত্রগণ মোট ১৩৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে

পুনরায় শকগণ উজ্জয়িনী অধিকার করে এবং শকাব্দের প্রতিষ্ঠা করে।

উল্লিখিত কাহিনী সর্ব্বাংশে সত্য কিনা তাহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু তাহার কোন কোন ঘটনার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। কাল-কাচার্য্য সিন্ধুনদ পার হইয়া শকগণের রাজ্যে গিয়াছিলেন কাহি-নীতে এইরূপ বর্ণিত আছে। ঠিক ঐ সময়ে যে শকগণ আফগানি স্থানের দক্ষিণভাগে রাজ্য-বিস্তার করিয়াছিলেন আমরা পূর্ব্বে তাহা দেখিয়াছি।

'কালকাচার্য্য কথা' হইতে জানা যায় যে শকগণ ৭৮ খৃঃ অব্দে উজ্জয়িনী অধিকার করে এবং ঐ সময়ে শকাব্দ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ঘটনাটিও ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া মনে হয়। ক্ষত্রপ ও মহাক্ষত্রপ উপাধিধারী এক পরাক্রান্ত রাজবংশ তিন শত বৎসরেরও অধিক-কাল মালব ও তৎসন্নিহিত প্রদেশে রাজত্ব করেন, ইহা আমরা শিলা-লিপি ও প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতির সাহায্যে জানিতে পারিয়াছি। ইঁহারা যে শকবংশীয় তাহা সকলেই স্বীকার করেন। ইঁহাদের আদিপুরুষ চষ্টন উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করিতেন, তাহা আমরা টলেমির গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি। এই চষ্টন কোন সময়ের লোক সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কিন্তু সম্প্রতি নবাবিষ্কৃত শিলালিপির প্রমাণে প্রতি-পন্ন হয় যে চষ্টন আনুমানিক ৭৮ খৃঃ অব্দে উজ্জয়িনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।* সুতরাং কালকাচার্য্যের কাহিনীর এই অংশ সর্ব্বথা সত্য বলিয়া মনে হয়।

উজ্জয়িনীর এই শকজাতীয় রাজবংশের আদিম ইতিহাস কিছুই জানা যায় না। কিন্তু পূর্ব্বে আমরা শকজাতির যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাহার সহিত কালকাচার্য্যের উপাখ্যান সংযোগ

---

* এ সম্বন্ধে বিস্তৃত কারণাবলী যাঁহারা জানিতে চাহেন তাঁহারা এশি-য়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত "Date of Chastana" নামক আমার প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন। (J.—A. S. B. June, 1914)

করিলেই ইহার মীমাংসা হয়। আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে শক-স্থান ও তৎসন্নিহিত প্রদেশে যে সমুদায় শকজাতীয়গণ বাস করিত তাহাদেরই একদল এইরূপে উজ্জয়িনী অধিকার করে।

উজ্জয়িনীর এই শক রাজবংশের একটি বিষয় বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। তাঁহাদের মুদ্রা ও শিলালিপিতে তাঁহারা বরাবর আপনা-দিগকে ক্ষত্রপ বা রাজপ্রতিনিধি বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। কোথাও আপনাদিগকে রাজা, মহারাজা প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করেন নাই। তাঁহাদের ন্যায় পরাক্রান্ত রাজবংশের পক্ষে এরূপ করা বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা। ইহা হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে প্রথমে এই রাজ-বংশ অপর কোন রাজবংশের অধীন ছিল, এবং তাহাদের প্রতিনিধি-স্বরূপ রাজ্যশাসন করিত। মারহাট্টা পেশবার ন্যায় পরিণামে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হইলেও তাহারা সেই পূর্ব্ব উপাধিই বজায় রাখিয়া-ছিল। হায়দ্রাবাদের নিজাম ও অযোধ্যার উজীরও এইরূপ করিয়াছেন।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে কোন্ রাজবংশের প্রতিনিধি-স্বরূপ ইহারা উজ্জয়িনী শাসন করিত? ইহার কোন সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। তবে এক্ষেত্রে আমরা একটি অনুমান করিতে পারি। পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি তক্ষশিলা এবং তৎসন্নিহিত প্রদেশে মগ নামক এক শক-রাজা স্বীয় বংশের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। আমরা আরও দেখিয়াছি যে সম্ভবতঃ এই মগ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর লোক। যদি তাহা হয় তবে খুব সম্ভব উজ্জয়িনীর শক ক্ষত্রপ চষ্টন ইঁহা-রই প্রতিনিধি। এই অনুমানের সমর্থক দু একটি প্রমাণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। উজ্জয়িনীর শক-রাজবংশের আদি পুরুষ চষ্টনের মুদ্রায় খরোষ্ঠি অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়। উজ্জয়িনীতে কিন্তু কোন কালেই খরোষ্ঠি অক্ষরের প্রচলন ছিল না। অপরপক্ষে তক্ষশিলায় এবং তৎসন্নিহিত প্রদেশে এই খরোষ্ঠিই প্রচলিত ছিল। সুতরাং চষ্টনের মুদ্রার খরোষ্ঠি অক্ষর তক্ষশিলার বা তদঞ্চলের কোন রাজার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের পরিচয় দান করে।

তক্ষশিলা নামক স্থানে প্রাপ্ত তাম্রফলকে উৎকীর্ণ একখানি লিপিতে তাহার তারিখ এইরূপ ভাবে দেওয়া হইয়াছে,—"মহারাজা মগের ৭৮ বৎসরে।" কেহ কেহ ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"মহারাজা মগ কর্ত্তৃক স্থাপিত অব্দের ৭৮ বৎসরে।" 'কালকাচার্য্য কথা' হইতে আমরা জানিতে পারি যে শকগণ উজ্জয়িনী অধিকার করিলে শকাব্দ প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা দেখিয়াছি মগ সম্ভবতঃ খৃঃ প্রথম শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন;—সুতরাং অসম্ভব নহে যে মগই শকাব্দের প্রবর্ত্তক।

কিন্তু উভয়ের এই পরস্পর সম্বন্ধ সত্য অথবা কল্পিত হউক, তক্ষশিলায় ও উজ্জয়িনীতে যে দুইটী পরাক্রান্ত শকবংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি। তক্ষশিলার রাজবংশ অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। সম্প্রতি মার্শাল সাহেব তক্ষশিলার অ্যাজেসের যে তাম্রলেখ আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার তারিখ ১৩৬ বর্ষ। ইহা যদি শকাব্দ হয়, তবে এই বংশ ২১৪ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিল বলিতে হইবে। কিন্তু খুব সম্ভবতঃ ইহার বহু পূর্ব্বেই এই রাজবংশ ক্ষীণবল হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহাদের বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধঃপতন ঘটিয়াছিল। যে ইয়ু-চি জাতি, নিদারুণ অদৃষ্টলেখার ন্যায়, সর্ব্বদা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদিগকে দেশ হইতে দেশান্তরে তাড়াইয়া ফিরিতেছিল, তাহাদেরই এক শাখা কুশাণবংশের দ্বারা ভারতবর্ষে শকদিগের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত হয়। কিন্তু অদৃষ্টের কি নিদারুণ পরিহাস! এই চির-শত্রু কুশাণবংশের রাজা কনিষ্ক শকশ্রেষ্ঠ ও শকাব্দের প্রবর্ত্তক বলিয়া অদ্যাপি কোন কোন ইতিহাসে কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছেন।

তক্ষশিলার শকরাজবংশ অপেক্ষা উজ্জয়িনীর শকরাজবংশ অধিক-কাল স্থায়ী হইয়াছিল। ৭৮ খৃঃ অব্দে ইহার প্রতিষ্ঠা হয় এবং প্রায় ৪০০ খৃঃ অব্দে গুপ্তবংশীয় মহারাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক ইহা ধ্বংস হয়। এই সুদীর্ঘকাল ভারতবর্ষে থাকিয়া শকরাজগণ

ভাবে, ভাষায়, ধর্ম্মে ও আচারব্যবহারে হিন্দু হইয়াছিলেন এবং পরিণামে তাঁহারা বিরাট হিন্দুজাতির সহিত মিশিয়া গিয়াছেন।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে শকজাতির কাহিনী ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি বিচিত্র ঘটনা। মধ্য-এশিয়ার সিরদরিয়ার পার হইতে বিতাড়িত হইয়া কত ঘটনা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া আসিয়া অবশেষে এই জাতি ভারতবর্ষে শেষ আশ্রয় গ্রহণ করে। ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহার অনুরূপ ঘটনা আমরা আরও দেখিতে পাই,—দেখিতে পাই কত সভ্য অসভ্য জাতি ক্ষীণ-কায়া স্রোতস্বিনীর ন্যায় সুদূর গিরিগাত্র হইতে উৎপন্ন হইয়া, অশেষ বাধা বিপত্তি সহ্য করিয়া, অবশেষে এই ভারতবর্ষের মহা মানব-সাগরে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। দেখিতে পাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিচিত্র কবিপ্রতিভার ও বিরাট কল্পনার সাহায্যে যে মহামিলন উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা কেবল কবিত্ব হিসাবে নহে ঐতিহাসিক হিসাবেও সত্য।

শকজাতির ইতিহাস আলোচনা করিলে সেই মহান্ সত্যের একাংশ আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়।*

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।

---

* প্রবন্ধশেষে পাঠকবর্গের প্রতি আমার এই অনুরোধ যেন তাঁহারা মনে রাখেন, এ প্রবন্ধ সর্ব্বসাধারণের জন্য লিখিত, সুতরাং সবিস্তার বাদানুবাদ বা যুক্তিতর্কের স্থান এ প্রবন্ধে নাই। প্রবন্ধোক্ত অনেক মতবাদই সাধারণ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণকর্ত্তৃক এখনও স্বীকৃত হয় নাই—তাহা প্রায়ই আমার নিজের মত এবং তাহার দোষগুণও সকলই আমার নিজের।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

কৃষ্ণকথা শুনিতে ও বলিতে ভাল লাগে। তারই জন্য সুযোগ পাইলেই বৈষ্ণব পদাবলী শুনিতে যাই, আর অমন করিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া, নানাভাবে ও নানা অছিলায় কৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনা করি। গত বৎসর নবপর্য্যায় "বঙ্গদর্শনে" কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে গোটাকয়েক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, কিন্তু বঙ্গদর্শন সম্পাদক প্রিয় সুহৃৎ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের অকাল-মৃত্যুতে "বঙ্গদর্শন" বন্ধ হইয়া গেল, আমার কৃষ্ণকথা ফুরাইল না। ফলতঃ "বঙ্গদর্শনে" এই আলোচনার মুখবন্ধ পর্য্যন্ত শেষ করিবার অবসর মিলে নাই। তাই আবার নূতন করিয়া "নারায়ণে" কৃষ্ণতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

এই বয়সে, এতদিন পরে, কৃষ্ণকথা যে মিষ্ট লাগিতে আরম্ভ করিয়াছে, কাহারও কাহারও চক্ষে ইহা দোষের কথা, ইহা জানি। কিন্তু এ দোষটা কি বয়সের, না রক্তের, এখনও ঠিক ঠাওর করিয়া উঠিতে পারি নাই। তবে শিক্ষার দোষ যে নয়, ইহা নিঃশঙ্কোচেই কহিতে পারি। বৈষ্ণব পরিবারে জন্মিয়াও কোনও দিন কোন প্রকারের বৈষ্ণব-শিক্ষা পাই নাই। ধর্ম্মমত বা ধর্ম্মাচরণ সম্বন্ধে বাঙ্গালা দেশের ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য সমাজে বৈষ্ণব ও শাক্তের মধ্যে কোনও বিশেষ প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইঁহাদের বীজমন্ত্রই কেবল ভিন্ন, নতুবা বিবাহাদি সংস্কার এবং নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ উভয় সম্প্রদায়েরই এক। বীজমন্ত্র অতি গোপনীয় বস্তু, এ মন্ত্র নিজের রসনায় উচ্চারণ করিয়া নিজের কাণেও শুনিতে নাই। তাহাতে মন্ত্রের শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, সাধকের প্রত্যবায় হয়। কে কোন্ মন্ত্র জপ করে, অপরে তাহা শুনিতে পায় না। মা-বাবা কৃষ্ণমন্ত্রই জপ করেন, একটু বড় হইলে ইহা শুনিয়াছিলাম বটে, কিন্তু এই কৃষ্ণমন্ত্র বস্তুটা যে কি, ইহা জানি নাই। বৈষ্ণব গোঁসাইরা আমাদের কুলগুরু ছিলেন।

বয়স হইলে শুনিয়াছি তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নাকি খুব ভক্ত ও পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তাঁরা কেবল দুর্গোৎসবের সময়েই আমাদের বাড়ী আসিতেন। তখন মহাপূজার ধূম লাগিয়া যাইত। ব্রাহ্মণ চণ্ডীপাঠ করিতেন। তন্ত্রধারক মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন, পুরোহিত সে মন্ত্রের আবৃত্তি করিয়া প্রতিমার পূজা করিতেন। ছাগাদি বলি হইত। দেবতার ভোগ লাগিত। গীতবাদ্য ও খাওয়াদাওয়ার আনন্দকোলাহলের মধ্যেই সকলে থাকিত। এই রাজসিক ব্যাপারের ভিতরে কৃষ্ণকথা বলিবার বা শুনিবার অবসর মিলিত না। আর গোস্বামী প্রভুরাও পূজার প্রণামী লইতেই আসিতেন, শিষ্যের বাড়ী ধর্ম্মশিক্ষা দিতে আসিতেন না। ধর্ম্মে ধর্ম্মে একটা রেষারেষী না বাধিলে বিশেষ করিয়া ধর্ম্মশিক্ষা দিবার কোনও প্রেরণাও ভাল করিয়া চাগিয়া উঠে না। বিশেষতঃ মধ্যযুগের গতানুগতিক হিন্দুধর্ম্ম আচারের ধর্ম্ম, প্রচারের ধর্ম্ম নয়। মতবদ্ধ খৃষ্টীয় ধর্ম্মের আক্রমণের মুখে হিন্দু আজ আপনার ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত হইয়াছে। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, বাঙ্গালা দেশের পল্লিসমাজে, এই প্রচারের প্রয়োজন উপস্থিত হয় নাই। সে'কালে হিন্দু-সমাজে শাক্ত-বৈষ্ণবে কোন প্রকারের সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতাও দেখা যায় নাই। শাক্ত গৃহস্থের বাড়ীতে রাসযাত্রা দেখিয়াছি। বৈষ্ণবের বাড়ীতে হামেষাই কালী দুর্গা প্রভৃতির পূজা হইত। শাক্তেরাও রাধাগোবিন্দের ভজন গাইতেন, বৈষ্ণবেরাও কালীদুর্গার নাম লইতেন এবং শ্যামা বিষয়ক মালসী গান ভক্তিভরে শুনিতেন ও গাহিতেন। বৈষ্ণব-সন্তান হইয়াও শৈশবে ও বাল্যে প্রতিদিনই আমি দুর্গানাম লইয়া শয্যা হইতে উঠিতাম। আপদেবিপদে দুর্গা দুর্গা বলিয়াই ডাকিতাম। বিশেষ বিপন্ন হইলে উদ্ধারকল্পে কালী দুর্গার নিকটেই মানস বা "মানত" করিতাম। শৈশবে ও বাল্যে এক বৈরাগীদিগের মুখে, আর কখনও কখনও সন্ধ্যা আরতির কালেই, রাধাকৃষ্ণের নাম শুনিতাম; অন্যথা কৃষ্ণনামের সঙ্গে কোনই সম্বন্ধ ছিল না।

কৃষ্ণকথা শুনিবার ও বুঝিবার সময়ও তখন আসে নাই। কৃষ্ণকথা ধর্ম্মজীবনের আদি কথা নয়, শেষ কথা। ধর্ম্মের গোড়ার কথা ভক্তি নয়, ভয়; রতি নয়, বিস্ময়। বহুদিন হইতেই নাকি আমাদের দেশের ধর্ম্মে একটা উদ্ভট খিচড়ী পাকাইয়া গিয়াছে, তাই বৈষ্ণবেরাও "বিপত্তৌ মধুসূদন" বলিয়া ডাকেন। কিন্তু প্রকৃত কৃষ্ণোপাসনার সাধ্য মধুসূদন নহেন। মধুসূদনকে ডাকে লোকে ভয়ে, কৃষ্ণকে ডাকিতে হয় ভক্তিভরে। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ভয় বা বিস্ময়ের সম্পর্ক নাই। কিন্তু শৈশবের ও বাল্যের ধর্ম্ম ভয় ও বিস্ময়কে ধরিয়াই ফুটিয়া উঠে। শৈশবে দেবতার শরণ লইতাম ভয়ে বা লোভে। আর্ত্ত বা অর্থার্থী হইয়াই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য, কিম্বা ঈপ্সিত বস্তু লাভ করিবার আশায়ই কালী দুর্গা প্রভৃতিকে ডাকিতাম। ইহাই সে বয়সের সহজ ধর্ম্ম ছিল।

শৈশবের ও বাল্যের ধর্ম্ম শাক্তের ধর্ম্ম, খাঁটি বৈষ্ণবের ধর্ম্ম নয়। সহজ স্বভাবের পথে চলিলে সকলকেই প্রথমে শাক্ত হইতে হয়, আর পরিণামে এই শাক্তধর্ম্ম সাধন করিতে করিতেই তাহাকে ছাড়াইয়া গিয়া ব্রজের পথে দাঁড়াইতে হয়। কিন্তু ধর্ম্ম এখন আর সহজ পথে ত চলে না। এখন এ বস্তু পৈত্রিক, কৌলিক হইয়া পড়িয়াছে। বৈষ্ণবকুলে যে জন্মে, সে'ই বৈষ্ণব ধর্ম্ম সাধন করিতে যায়। শাক্তকুলে যে জন্মিল আমরণ সে গতানুগতিকভাবে ঐ শাক্তধর্ম্মই সাধন করে। হিন্দুধর্ম্মে এখন অধিকার অনধিকার বিচার আর নাই। আছে কেবল কুলের বিচার। খৃষ্টীয়ান প্রভৃতি ধর্ম্ম যেমন মতবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, হিন্দু-ধর্ম্ম সেইরূপ কুলবদ্ধ হইয়াছে। তাই বালকেরাও বৈষ্ণব সাজিয়া বেড়ায়, বৃদ্ধেরাও শাক্ত থাকিয়া যান। প্রকৃতপক্ষে বাল্যের ধর্ম্ম শাক্তের ধর্ম্ম। কালী দুর্গা প্রভৃতি দেবতাই বাল্যকল্পনাকে জাগা-ইয়া তুলেন। এরই জন্য বাল্যকালে কালী দুর্গাকেই অমন করিয়া ডাকিতাম। কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন হইত, কিন্তু বালককে কেবল নাম দিয়া

ভুলান' যায় না। কৃষ্ণমূর্ত্তির পূজাও বিরল ছিল। এক দোলযাত্রা ও ঝুলনযাত্রা, আর কোথাও কোথাও রাসের সময়েই কেবল রাধা-কৃষ্ণের মূর্ত্তির পূজা হইত। রাসযাত্রাতে মাটির মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হইত, কিন্তু দোলযাত্রা বা ঝুলনযাত্রাতে গৃহপ্রতিষ্ঠিত বিগ্রহেরই ভোগ-আরতি হইত। এ বিগ্রহ পাথরের বা ধাতুর; আকারে ছোট; সকল সময়ে ভাল করিয়া নজরেও পড়িত না। এ মূর্ত্তি দ্বিভুজ, নরমূর্ত্তি। আর মানুষের বিগ্রহকে পূজা করা বড় কঠিন কথা। এ মূর্ত্তি দেখিয়া প্রাণে ভয় বা বিস্ময়ের উদয় হয় না। কালীমূর্ত্তি বা দুর্গাপ্রতিমা যেমন ভাবে চিত্তকে অভিভূত করিত, রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহে তেমনটা করিতে পারিত না। কালী দুর্গার মূর্ত্তিতে প্রাণে দেবতা-জ্ঞান ফুটাইয়া দিত, রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহেতে এটা করিতে পারিত না। কালী দুর্গাকে দেখিয়া মন ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইত। এই ভয় ও এই বিস্ময় জড়াইয়া যে ভাবটা জন্মে, বৈষ্ণব সাহিত্যে তাহাকেই ঐশ্বর্য্য-বোধ কহে। রাধাকৃষ্ণের ভজনায় এই ঐশ্বর্য্যজ্ঞান নাই। এ সকল কথা অনেক পরে শুনিয়াছি। শৈশবে কোনও দিন শুনি নাই, শুনিলেও ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিতাম না। এই কথা-টাই কিন্তু কৃষ্ণতত্ত্বের মূল কথা। এ কথাটা যে না বুঝে, কৃষ্ণ-কথা কত মিষ্ট সে ইহা জানে না। কৃষ্ণ যে কি বস্তু ইহাও সে বুঝে না। কেন কৃষ্ণমূর্ত্তি দ্বিভুজ মুরলীধর নবীন কিশোর; রাধি-কার বিগ্রহ কেন নবীন কিশোরীর অনুরূপ; কেন ইঁহাদের পাঁচটা মুখ বা দশটা হাত নাই; কেন যে ইঁহারা এতটা মানুষের মতন, অথচ সকল দেবতার পরম দেবতা;—বৈষ্ণবদের মধ্যেই কয়জনে বা এ সকল কথা বুঝেন ও জানেন,—অন্যেপরে কা কথা? এ অবস্থায় বৈষ্ণবকুলে জন্মিয়াও যে বাল্যে বা যৌবনে কৃষ্ণ যে কি বস্তু, বৈষ্ণব ধর্ম্মটাই সত্য সত্য কি, ইহার কোনও সন্ধান পাই নাই, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। বহুদিন এ বিষয়ে কোন জিজ্ঞাসারও উদয় হয় নাই।

আর জীবনের এই "বেলি অসকালে" এই জিজ্ঞাসাকে বিশেষ

করিয়া জাগাইয়াছে এই কয়টা ইন্দ্রিয়। চক্ষু রূপের জন্য পাগল। কত রূপ দেখিল, কত রূপ বুকে টানিয়া ধরিল, কিন্তু তার রূপের পিপাসা কিছুই কমিল না। কাণ দুটা মধুর শব্দের জন্য আকুল। আজন্মকাল শুনিয়া শুনিয়া তার শুনার সাধ মিটিল না। নাসিকা গন্ধের জন্য সদাই সজাগ, কত গন্ধ শুঁকিল, কিন্তু তার আশা পূরিল না। এইরূপে সব কটা ইন্দ্রিয় কি যেন চায়, কি যেন পায় না, আর পায় না বলিয়াই চঞ্চল হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করে। যৌবনে ইন্দ্রিয়গুলি যখন বড় সতেজ, বড় দুর্দ্দান্ত ছিল, সকল বিধিবাঁধন কাটিয়া ছিঁড়িয়া যাইবার জন্য যখন চারিদিকে প্রাণটাকে লইয়া টানা-টানি করিত, তখন শুনিয়াছিলাম, এগুলিকে চাপিয়া রাখাই ধর্ম্ম। কিছু কিছু যে চাপিয়া রাখিতে চাই নাই, এমনও নয়। ভাবিয়াছিলাম বার্দ্ধক্যে বুঝি বা এরা শান্ত হইবে। কিন্তু তাহা হইল কৈ ? প্রয়াসের শক্তি গেল, কিন্তু পিয়াসার নিবৃত্তি হইল কৈ ? বরং বার্দ্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে এ পিপাসা আরও যেন বাড়িয়া চলিয়াছে। যাহা এ পর্য্যন্ত দেখিলাম না, চক্ষু যে কেবল তাহাই খুঁজিয়া বেড়ায়। যে মধুর শব্দ আজও কোথাও শুনিলাম না, কাণ যে সর্ব্বদা তারই জন্য উৎকর্ণ হইয়া আছে। যে গন্ধ আজও শুঁকিতে পাইলাম না, নাসিকা যে তাই কেবল শুঁকিতে চাহে। যে স্পর্শ আজও পাইলাম না, প্রতি অঙ্গ যে তারই জন্য তৃষিত ক্ষুধিত হইয়া আছে।

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল,
সোহি মধুর বোল শ্রবণহি শুনমু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়াইনু
না বুঝিনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

এ কেবল রাধিকার কথা নহে, ইহা প্রকৃতি মাত্রেরই চিরন্তন আক্ষেপ। আর এ পিপাসা কি ইন্দ্রিয়ের, না মনের? একি শরীরের না শরীরীর,—দেহের না আত্মার? যদি সত্যই এ পিপাসা কেবল ইন্দ্রিয়ের হইত, তবে ইন্দ্রিয় যখন শিথিল হইল, তখন ইহা কমিল না কেন? এ যদি শরীরেই হবে, তবে শরীরের অপচয়ে তার ক্ষয় হয় না কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দিবে কে?

প্রশ্নটা নূতন নহে, এ যে বিশ্বসমস্যা। নিজেকে যে'ই সর্ব্ব-সংস্কারবর্জ্জিত হইয়া, সত্যভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখে, তারই সম্মুখে এ সমস্যা উপস্থিত হয়। কেহ বা ইহাকে চাপিয়া রাখে, কেহ বা কোনও রকমে গোঁজামিল দিয়া ইহার একটা ধামা-চাপা মীমাংসা করিয়া লয়। যে চাপিয়া রাখে না, বা রাখিতে পারে না, এই বিশ্বসমস্যার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া, তাহাকে পরিণামে কৃষ্ণতত্ত্বে পৌঁছিতেই হয়। এই ইন্দ্রিয় কটাকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে পার। এগুলি ভেদবুদ্ধি-মূলক। অদ্বৈত-অভেদ-জ্ঞানে কে, কাহাকে, কি দিয়া, দেখে? কে, কি, কিসের দ্বারা, শুনে? সেখানে বিষয় নাই, কেবল বিষয়ী আছেন। ভোগ্য নাই, শুদ্ধ ভোক্তা আছেন। এই পথে একরূপ যো সো করিয়া এই জিজ্ঞাসাকে চাপিয়া রাখিতে পারা যায়। আমাদের দেশের নিবৃত্তপথাবলম্বী বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর দল এই ভাবেই এই বিশ্বজিজ্ঞাসার একটা মীমাংসা করিয়াছেন। এই মীমাংসায় যাঁরা সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন, তাঁদের নিকটে কৃষ্ণকথার কোনও অর্থ নাই। সাধ্য তাঁদের নির্গুণ ব্রহ্ম। সিদ্ধি তাঁদের কৈবল্য। সাধন তাঁদের ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ। আশ্রম তাঁদের সন্ন্যাস। আনন্দ তাঁদের নির্ব্বিকল্প সমাধিতে।

এই জগৎকে উড়াইয়া দিতে পারি নাই, উড়াইয়া দিতে কোনও দিন চাহিও নাই। ইন্দ্রিয় কটাকে রিপু বলিয়া কোনও দিন নির্ম্মূল করিতে পারি নাই, করিতে চাহিও নাই। সংসারের বিবিধ সম্বন্ধকে "অবিদ্যাবিষয়ানি" ভাবিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারি নাই, করিতে

চাহিও নাই। আর এগুলিকে সত্য জানিয়া ধরিয়াছিলাম বলিয়াই পরিণামে কৃষ্ণতত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছি। চক্ষুর রূপের পিপাসা, কাণের শুনার আকাঙ্ক্ষা, রসনার রসের বাসনা, এগুলির পরিতৃপ্তি হয়, না হয় না? প্রাণের আত্মদানের অভিলাষ, যে দানের ভিতর দিয়াই প্রাণকে আবার প্রাণ পূরিয়া পাওয়া যায়, তার পূর্ণতা সম্ভব, না অসম্ভব? সংসারের সম্বন্ধসকলের কোনও নিত্য আশ্রয় ও সার্থকতা আছে, না নাই? সখাকে ধরিয়াই সখ্য জন্মে; কিন্তু সখাকে চিরদিন ধরিয়া রাখিতে পারে না। কিন্তু রসের আশ্রয় নষ্ট হইলেই রস ত আর ফুরাইয়া যায় না। প্রাণের রসপিয়াসাও চলিয়া যায় না। এই সখ্য রতির নিত্য আশ্রয় ও পরিপূর্ণ সার্থকতা আছে, না নাই? সেইরূপ বাৎসল্যেরও নিত্য আশ্রয় আছে, না নাই? মাধুর্য্যেরও কোনও নিত্য আশ্রয় আছে, না নাই? যদি না থাকে, তবে প্রচলিত মায়াবাদই সত্য।

তুমি কার, কে তোমার, কারে বল রে আপন?
মোহমায়া নিদ্রাবশে দেখিছ স্বপন!—

ইহাই জীবনের চরম অর্থ ও পরম সত্য হইয়া দাঁড়ায়। এই মোহমায়াজাল ছেদন করাই ধর্ম্ম হইয়া উঠে। কেহ কেহ এতেই তৃপ্ত হয়। যারা এমন করিয়া এ সকল রসের সম্পর্ককে নিষ্ঠুর মায়াবীর ইন্দ্রজালখেলা বলিয়া গ্রহণ করিয়া স্থির থাকিতে পারে না, তাদের পক্ষে কৃষ্ণতত্ত্ব ভিন্ন আর গতি নাই। জগৎকে মিথ্যা, আর সংসারের স্নেহের, প্রীতির, প্রেমের, সেবার, ভক্তির সম্বন্ধসকলকে মায়িক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি নাই বলিয়াই ঋজুকুটীল বহু পথ ঘুরিয়া শেষে কৃষ্ণতত্ত্বের খোঁজ পাইয়াছি।

আপনার অন্তঃপ্রকৃতির প্রেরণায়, সংসার-পথে চলিতে চলিতেই এ তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছি, শাস্ত্র পড়িয়া পাই নাই। আর প্রচলিত শাস্ত্রের পথে যাইয়া যে এ তত্ত্বের সন্ধান পাই নাই, ইহা পরম সৌভা

গ্যের কথাই মনে করি। সে পথে গেলে গতানুগতিক ভাবে, কৃষ্ণতত্ত্বের একটা কল্পিত অর্থ করিয়াই লইতাম। শাস্ত্র আপনার যুগপ্রভাবকে অতিক্রম করিতে পারে না। যে যুগে যে শাস্ত্র প্রচারিত হয়, তাহাতে সেই যুগের প্রচলিত মত, বিশ্বাস, সিদ্ধান্ত, আচারবিচার ও রীতিনীতি প্রভৃতি জড়াইয়া থাকে। আর এক যুগের মত, বিশ্বাস, সিদ্ধান্ত ও আচারবিচারাদি পর যুগেও ঠিক পূর্ব্বকার মতন কোথাও থাকে না। যোজনান্তর যেমন ভাষা ভিন্ন হয়, যুগে যুগে সেইরূপ জনসমাজের মনো-ভাবের এবং বহিরাচরণেরও বিস্তর পার্থক্য দাঁড়াইয়া যায়। ইহা জগতেরই নিয়ম। এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াই যুগে যুগে নূতন নূতন সমস্যার উদয় হইয়া, নূতন নূতন যুগধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। এক যুগের ধর্ম্ম আর এক যুগের প্রয়োজন সাধন করিতে পারে না। এক যুগের শাস্ত্র অবলম্বনে অপরযুগে তত্ত্ব-জ্ঞানলাভ বা ধর্ম্মসাধন করাও সম্ভব হয় না। আমাদের দেশের বর্ত্তমান শাস্ত্র যে যে যুগে রচিত হইয়াছিল, সেগুলি সেই সেই যুগেরই জিজ্ঞাসা-নিবৃত্তির চেষ্টা করিয়াছে। সেই পুরাতন শাস্ত্রের দ্বারা এ যুগের নূতন জিজ্ঞাসার সম্যক মীমাংসা হওয়া সম্ভব নহে। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশের লোকের মতিগতি যেরূপ ছিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া, সেকালের লোকের মনে যে সকল জিজ্ঞাসার উদয় হইতেছিল, চৈতন্যচরিতামৃতাদি প্রামাণ্য বাঙ্গালা বৈষ্ণব শাস্ত্রে তাহারই মীমাংসার পথ দেখাইয়াছে। এই সকল গ্রন্থে কতকগুলি চিরন্তন সত্যের ও সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, সত্য। কিন্তু মূল সিদ্ধান্ত সত্য হইলেও, সে কালে যে ভাবে তার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, সেই ভাবে সেই তত্ত্বকে বা সিদ্ধান্তকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলে, তাহাতে আমাদের শ্রদ্ধার উদ্রেক বা জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি করা কখনই সম্ভব হইবে না। এক যুগের প্রামাণ্য শাস্ত্রের পর যুগেও সেইরূপ প্রামাণ্য-মর্য্যাদা থাকে না বলিয়াই, যুগে যুগে সাধক ও সিদ্ধপুরুষেরা এবং তাঁহাদের অনুগত মনীষী ভক্তগণ আপন আপন যুগ-সমস্যাকে লক্ষ্য করিয়া নূতন শাস্ত্র প্রচার করেন,

কিম্বা পূর্ব্বতন শাস্ত্রেরই নূতন ভাষ্যাদি রচনা করিয়া শাস্ত্রধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখেন। চৈতন্যচরিতামৃতাদি প্রামাণ্য বাঙ্গালা বৈষ্ণবগ্রন্থ, কতকটা নূতন শাস্ত্র, এবং কতকটা পুরাতন শাস্ত্রের নূতন যুগভাষ্য রূপেই গৃহীত হইয়া আসিয়াছে। এইরূপে বেদ, উপনিষদ, গীতা, ব্রহ্মসূত্র, ভাগবতাদি সকল প্রাচীনশাস্ত্রেরই যুগে যুগে বহুবিধ ভাষ্য রচিত হইয়া, তাহাদের প্রামাণ্যকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। যে ভাগবত কৃষ্ণতত্ত্বের বিশেষ অবলম্বন ও উদ্দীপনা, সেই ভাগবতেরই কত না ভাষ্য রচিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্বে শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি ভাগবতের ভাষ্য লিখিয়া যান, তাঁর পরেও গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-সম্মত সিদ্ধান্তকে আশ্রয় করিয়া, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আবার তাহার নূতন ভাষ্য লিখিয়া গিয়াছেন। আর সেই ভাষ্য যতই কেন উৎকৃষ্ট হউক না, তাহাতেই আমাদের যুগের সমস্যারও যে পূর্ণ মীমাংসা হইতে পারে, এরূপ কল্পনাও করা যায় না। এই যুগের লোকমত ও এই যুগের জিজ্ঞাসাকে লক্ষ্য করিয়া, তাহার সঙ্গে প্রাচীন শাস্ত্রের ও পুরাতন ভাষ্যের সঙ্গতি ও সমন্বয় সাধনের জন্য, উপনিষদ, গীতা, ভাগবতাদি প্রামাণ্য গ্রন্থের নূতন ভাষ্যের প্রয়োজন। এতাবৎকাল আমরা কেবল একটা বিরাট বিরোধের মধ্যেই পড়িয়াছিলাম। এখন ক্রমে সমন্বয়ের পথে আসিয়া দাঁড়াইতেছি। এই সমন্বয়মুখে, ক্রমে ক্রমে ভগবদিচ্ছায়, আমাদের এই যুগেও, এই যুগের বিশিষ্ট ভাব, মত, অভিজ্ঞতা ও আদর্শসম্মত ভাষ্যাদি অবশ্যই রচিত হইবে। তাহারই প্রতীক্ষায় আমরা বসিয়া আছি।

এইরূপ যুগ-ভাষ্য এ পর্য্যন্ত রচিত হয় নাই বলিয়া, আমাদের পক্ষে শুদ্ধ শাস্ত্রাবলম্বনে তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া সহজ নয়, আদৌ সম্ভব কি না, তাহাই বলা কঠিন। কোনও বিশেষ সিদ্ধান্ত যখন সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠে, বহুলোকের মত ও ভাবকে যখন তাহা অধিকার করিয়া বসে, তখনই প্রাচীন শাস্ত্র ও আধুনিক স্বানুভূতির সঙ্গে সমন্বয়-সাধন করিয়া যুগভাষ্যের প্রচার হয়। আমাদের এখনও সে অবস্থা উপ-

স্থিত হয় নাই। এই জন্য আমরা প্রকৃত পক্ষে নিজেদের ভিতরকার প্রেরণা ও অনুভূতির মধ্যেই এখন তত্ত্ব-বস্তুর মুখ্য সন্ধান পাইয়া থাকি।

আমি শাস্ত্র-সাহিত্য পড়িয়া শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের সন্ধান পাই নাই। অন্তর্জীবনের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গেই, শ্রীগুরুর কৃপায়, তিলে তিলে এই তত্ত্বটা আমার জ্ঞানেতে ফুটিয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে। বোধ হয়, আমার মতন আরো অনেকে স্বল্পবিস্তর এই পথেই যাহা কিছু কৃষ্ণতত্ত্বের আভাস পাইয়াছেন। এইরূপে বহুতর নব্যশিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের ভিতরকার ভাব ও অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করিয়া এদেশে বর্ত্তমানে একটা অভিনব বৈষ্ণবভাব ফুটিয়া উঠিতেছে। এ ভাবটা সম্পূর্ণ নূতন। ইহা কোনও মতেই গতানুগতিক নহে। মধ্যযুগের মায়াবাদপ্রধান অপরাপর তত্ত্বসিদ্ধান্তের সঙ্গে আধুনিককালের প্রত্যক্ষ-প্রধান তত্ত্বসিদ্ধান্তাদি যেমন অনেক ভিন্ন, মধ্যযুগের বৈষ্ণবভাব ও বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত হইতে, বর্ত্তমানে যে বৈষ্ণবভাব আমাদিগের চিত্তকে অধিকার করিতেছে, তাহাও সেইরূপ বিভিন্ন। এই কথাটা ভুলিয়া গেলে এই নববৈষ্ণবভাবের মর্ম্মগ্রহণ বা মর্য্যাদাবোধ অসম্ভব হইবে।

ইংরাজি পড়িয়া, য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার সংস্পর্শে আসিয়া, আমাদের অন্তরে পুরুষানুক্রমাগত বৈদান্তিক মায়াবাদের প্রভাবটা স্বল্পবিস্তর নষ্ট হইয়া যায়। আমাদের অব্যবহিত পূর্ব্বপুরুষেরা সংসারকে যে চক্ষে দেখিতেন, আমাদের পক্ষে সে চক্ষে দেখা অসম্ভব হইল। তাঁরা সমাজানুগত্যকে ধর্ম্ম বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন।

যদি যোগী ত্রিকালজ্ঞঃ সমুদ্রলঙ্ঘনক্ষমঃ।
তথাপি লৌকিকাচারঃ মনসাঽপি ন লঙ্ঘয়েৎ॥

যোগী ত্রিকালজ্ঞ এবং সমুদ্রলঙ্ঘনক্ষম হইলেও, কোনও মতেই লৌকিকাচারকে উলঙ্ঘন করিবেন না, ইহাই তাঁদের সংসারধর্ম্মের মূলকথা ছিল। সন্ন্যাসীরাও এ উপদেশকে অগ্রাহ্য করিতে সাহস পাইতেন না। ইংরাজি পড়িয়া আমরা সমাজদ্রোহী হইয়া উঠিলাম। আমা-

দের পুরাতন আদর্শ মানুষকে সর্ব্ববিষয়ে বিষয়বিমুখ করিতে চাহিত। লোকে কতকটা চোরের মতনই এ জগতের রূপরসাদি সম্ভোগ করিত। মানুষের মনকে শাস্ত্র দিয়া, তার কর্ম্মকে আচার-বিচার দিয়া, তার ধর্ম্মকে বাহ্যক্রিয়াকলাপ দিয়া, তার ভক্তিকে কল্পনা দিয়া, —এইরূপে শত বন্ধনে আমাদের মধ্যযুগের সাধনা আমাদিগকে বাঁধিয়া ছাঁদিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল। ইংরাজি শিক্ষা এসকল বাঁধন কাটিয়া দিল। কিন্তু এই নূতন বিদ্রোহে আমরা ঘরের বাহির হইলাম মাত্র, পথেরও সন্ধান পাইলাম না, আর কোথায় যে যাইব তারও ঠিকানা হইল না। ক্রমে সেই সন্ধান পাইয়াই এই অভিনব বৈষ্ণবভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিদেশীয় শাস্ত্র-সাহিত্য যে বস্তুর আভাসমাত্র দিয়াছিল কিন্তু তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে নাই, এখানে তারই প্রত্যক্ষ-লাভ করিলাম। য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনা যে রসের আস্বাদনমাত্র দিয়াছিল, কিন্তু তার প্রতিষ্ঠা কোথায় ও পরিণাম কি, ইহা বলিতে পারে নাই, আমাদের বৈষ্ণব সাধনায় তার সেই প্রতিষ্ঠা ও পরিণতির নির্দ্দেশ পাইলাম। এইরূপে ইংরাজি শিক্ষার আশ্রয়ে, য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার প্রেরণাতেই, বিদেশীয় ভাব ও আদর্শ আমাদের চিত্তে যে সকল দুরূহ জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করিয়াছিল, তারই মীমাংসার সন্ধানে যাইয়া আমরা এই বৈষ্ণবতত্ত্বের ও বৈষ্ণব-সাধনার খোঁজ পাইয়াছি। য়ুরোপীয় সাধনা সত্যের একটা দিক দেখাইয়াছিল, আমরা সেই দিক-টাকেই সকল দিক ভাবিয়া তারই পানে ছুটিয়াছিলাম। ক্রমে সে দিকে সকল প্রশ্নের মীমাংসা অসম্ভব দেখিয়া, তার অন্য দিকের অন্বে-ষণ করিতে যাইয়া, আমাদের নিজেদের যে সাধনাকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গিয়াছিলাম, তারই মধ্যে সেই সত্যেরই অপর দিক দেখিতে পাইলাম। এইজন্য আমরা আজ যে বৈষ্ণব-আদর্শের সন্ধান পাই-য়াছি, তাহা মধ্যযুগের আদর্শ অপেক্ষা পূর্ণতর। বিদেশীয় শিক্ষা ও সাধনা আমাদের চিত্তে যে লোভমাত্র জাগাইয়াছে, কিন্তু তার পরি-তৃপ্তির পথ নিজেও জানে না, আমাদিগকেও দেখাইতে পারে নাই,

আমাদের প্রাচীন সাধক ও সিদ্ধপুরুষ এবং বর্ত্তমান যোগী ও ভক্ত-দিগের উপদেশে ও চরিত্রে সেই পথের আভাস পাইয়া আমরা এই নূতন বৈষ্ণবভাবের অনুরাগী হইয়াছি। কেবল ইংরাজি পড়িয়া এ বস্তু পাইতাম না। ইংরাজি না পড়িয়াও পাইতাম না। কেবল স্বদে-শের সাধুসন্তদিকে দেখিয়া ইহার মর্ম্ম বুঝিতাম না। ইঁহাদেরে না দেখিয়াও বুঝিতাম না। ইংরাজি পড়িয়া, য়ুরোপীয় সাধনার উদ্দীপনা পাইয়া, গ্রীশীয় সাধনার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরস-বিভোর হইয়া, সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় লাভ করিয়া, এ সকল উদ্দীপনা ও আস্বাদনের প্রকৃত মূল্য ও মর্ম্ম যে কি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াই এই কৃষ্ণতত্ত্বের সন্ধান পাই-য়াছি।

শাস্ত্র এই তত্ত্বকে বাহির হইতে আনিয়া দেয় নাই। শাস্ত্র ত শব্দ। শব্দের নিজের ভিতরে তার অর্থ নাই। শব্দ ত কেবল কতক-গুলি ধ্বনির সমষ্টি। শব্দের অর্থ শব্দে নয়, কিন্তু যে বস্তু বা ভাবকে নির্দ্দেশ করে, তাহারই মধ্যে। মা শব্দ এমন মিষ্ট, কেবল ম্+আ বলিয়া নহে, কিন্তু সুমধুর মাতৃস্নেহের স্মৃতিটা প্রাণে জাগায় বলিয়া। শব্দ চিহ্নমাত্র। বস্তুর দ্বারাই শব্দের অর্থ প্রকাশিত হয়। যে প্রকৃত ভক্তকে দেখে নাই, ভক্তি তার নিকটে নিরর্থক ধ্বনিমাত্র। আগে নিজের অন্তরে জিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছিল, তার পরে শ্রীগুরুর উপদেশে, চরিত্রে, বিশেষতঃ তাঁর দেহের বিবিধ সাত্ত্বিকী বিকারের মধ্যে, সেই জিজ্ঞাসার মীমাংসার সামান্য ইঙ্গিত লাভ করিয়াছিলাম। এই ভাবেই কৃষ্ণতত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছি। শাস্ত্র এই তত্ত্বকে দেখায় নাই। গুরুকৃপায় অন্তরে স্বতঃস্ফূরিত তত্ত্বকে শাস্ত্রালোচনা একটু আধটু বিশদ করিয়াছে মাত্র। শাস্ত্র যেমন এই অন্তরের অনুভূতিকে পরিস্ফুট করিয়াছে, এই অনুভূতিও সেইরূপ শাস্ত্রের সত্য অর্থকে বিশদ করিয়া তুলিয়াছে। এই অনুভূতির বহিঃ-প্রামাণ্য ঐ শাস্ত্র। ঐ শাস্ত্রের শব্দরাশির সত্য অভিধান এই অনুভূতি। আর এই অনুভূতি ও ঐ শাস্ত্র উভয়কে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করিয়া ধরিয়া

আছেন যিনি, তিনিই সদ্‌গুরু। একদিকে তিনিই "চৈত্য"রূপে অন্তরের অনুভূতিকে জাগাইতেছেন, অন্য দিকে তিনিই "মোহান্ত"রূপে নিজের প্রত্যক্ষ সাধনাভিজ্ঞতার দ্বারা শাস্ত্রবাক্যের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করিয়া, তার ভিতরকার নিগূঢ় সত্যকে বাহিরের কল্পিত সত্যাভাস হইতে পৃথক করিয়া দিতেছেন। এই ভাবেই এ তত্ত্বের খোঁজ পাইয়াছি।

এই আলোচনার প্রথমেই কৃষ্ণ-তত্ত্ব ও কৃষ্ণ-চরিত্র যে ঠিক একই কথা নহে, এটা বলিয়া রাখা আবশ্যক। কৃষ্ণ-চরিত্রের আলোচনার জন্য শাস্ত্রানুশীলন অত্যন্ত প্রয়োজন। যে শ্রীকৃষ্ণের চরিত-কথা বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন; "প্রচার" ও "নবজীবনের" যুগের হিন্দু-পুনরুত্থান যে শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানে গিয়াছিল; ব্রহ্মসমাজের প্রচারক উপাধ্যায় গৌর গোবিন্দ রায় যে শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্মের আলোচনা করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ বাহিরের বস্তু, ভারতবর্ষের প্রাচীন সামাজিক জীবনের রঙ্গ—ভূমিতে তিনি বিবিধ লীলা করিয়া গিয়াছেন। মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি পুরাণ-কথাতে তাঁর কীর্ত্তিগাথা পড়িতে পাওয়া যায়। সেই শ্রীকৃষ্ণ ইতিহাসের শ্রীকৃষ্ণ। তিনি কৃষ্ণাবতার। এই কৃষ্ণাবতারের সন্ধান মুখ্যভাবে পুরাণ-ইতিহাসেই কেবল পাওয়া যায়। কিন্তু ইতিহাসের শ্রীকৃষ্ণ আর তত্ত্বের শ্রীকৃষ্ণ ঠিক এক নহেন। ইতিহাসের শ্রীকৃষ্ণ বাহিরের বস্তু, তত্ত্বের শ্রীকৃষ্ণ ভিতরের বস্তু। ইতিহাসের শ্রীকৃষ্ণ কে ও কি, তাহার বিচার করিতে হইলে মুখ্যভাবে তাঁহাকে ইতিহাসেই খুঁজিতে হইবে। তিনি একটা বিশেষ যুগে অবতীর্ণ হইয়া কতকগুলি বিশেষ কর্ম্ম-সাধন ও বিশেষ লীলা-প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অবতার মানিলেও যিনি বিশেষ যুগে অবতীর্ণ হন, সেই যুগের পূর্ব্বেও তিনি অবশ্যই ছিলেন, ইহাও মানিতে হয়। না মানিলে, তাঁর অবতারের অর্থ এবং প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। "নাসতঃ সজ্জায়তে"—অসৎ হইতে কখনও সতের উৎপত্তি হয় না। যিনি আবির্ভূত হইলেন তিনি আবির্ভাবের পূর্ব্বেও ছিলেন, তিরোভাবের পরেও রহিয়া গেলেন এবং এখনও আছেন, ইহা না

মানিলে আবির্ভাব তিরোভাবের কোনও অর্থ হয় না। বিশিষ্ট কালে, বিশেষ দেশে, শ্রীকৃষ্ণের অবতার মানিয়া লইলে,—অবতারের পূর্ব্বেও যেমন তিনি ছিলেন, পরেও সেইরূপই আছেন; অবতারের পূর্ব্বেও তিনি পূর্ণ ছিলেন, পরেও পূর্ণ আছেন; যাহা পূর্ণ তার জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয় নাই, হইতে পারে না; সে বস্তু নিত্য, অনাদি, অনন্ত, দেশ-কালের একান্ত অতীত,—এই কথাটাও মানিয়া লইতে হইবে। এই বস্তুর সন্ধান কেবল ইতিহাস দিতে পারে না। অন্তরে, আপনার চৈতন্যের মূলে, এ নিত্য বস্তুর সন্ধান না পাইলে, তার ঐতিহাসিক আবির্ভাব বা প্রকাশেরও মর্ম্মগ্রহণ করা সম্ভব হয় না। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের আলোচনা করিতে হইলে, বঙ্কিমচন্দ্রের পদাঙ্ক-অনুসরণ করিয়া শাস্ত্রের প্রামাণ্য কতটা ও অপ্রামাণ্য কি, ইহার বিচার করা আবশ্যক হয়। শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্মের তথ্য নির্ণয়ের জন্য মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি প্রাচীন পুঁথি ঘাঁটা নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বের সম্বন্ধে ইহা একেবারেই অনাবশ্যক। এখানে ইতিহাসের কথা শুনিয়া ফল নাই। তত্ত্বজ্ঞ, সত্যদর্শী, সাধক ও সিদ্ধ মহাপুরুষদিগের অন্তর্জীবনের অভিজ্ঞতা এবং সাক্ষ্যই এ বিষয়ে জিজ্ঞাসুর প্রধান আশ্রয় ও সহায়। কারণ এই তত্ত্বের শ্রীকৃষ্ণ বাহিরে নাই, ভিতরে। এই বস্তু নিত্য প্রকট ও নিত্যই অপ্রকট। এই কৃষ্ণলীলা নিত্যলীলা। রাধা, কৃষ্ণ, বৃন্দাবন, সকলি এখানে নিত্য বস্তু, তত্ত্ব-বস্তু, যুগপৎ দেশকালের অতীত এবং দেশকালে প্রতিষ্ঠিত। এই শ্রীকৃষ্ণ অবতার নন, কিন্তু অবতারী। সকল অবতারের ইনিই প্রকাশক, সকল অবতারের প্রতিষ্ঠা ইঁহাতে।

আর ইহাই মহাপ্রভু-প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত। কবিরাজ গোস্বামী কহিতেছেন—

অদ্বয়-জ্ঞান তত্ত্ব-বস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।

আর এই স্বরূপবস্তুই অবতারী। ভাগবতে সকল অবতারের সামান্য লক্ষণ বলিয়া, তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকেও গণনা করিয়া,—

তবে শুকদেব মনে পাঞা বড় ভয়।
যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয়॥
অবতার সব পুরুষের কলা-অংশ।
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংশ॥

আর যত অবতার বলিতে এখানে কৃষ্ণাবতার পর্য্যন্ত বুঝাই-তেছে। কারণ অবতার মাত্রেই জ্ঞাত, কিন্তু—

"কার অবতার এই বস্তু অজ্ঞাত।"

জ্ঞাত বা প্রকট অবতারেরা সর্ব্বদা সেই "অজ্ঞাত বস্তুকেই" নির্দ্দেশ করেন। গীতায় বিভূতিযোগের উপদেশ দিবার সময় শ্রীকৃষ্ণ আপ-নিই অর্জ্জুনকে এই কথা বলিয়াছেন—

বৃষ্ণিনাং বাসুদেবোঽহং পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়।

বৃষ্ণিবংশীয়দিগের মধ্যে আমিই বাসুদেব, পাণ্ডবদিগের মধ্যে আমি ধনঞ্জয়। শ্রীকৃষ্ণের বৃষ্ণিত্ব তাঁর একাংশ মাত্র। আর বাসুদেবরূপেই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি তাঁর অবতার অপেক্ষা যে অনেক বড়, তিনি যে আপনার অবতারেরও অতীত, শাস্ত্র আশ্রয় করিয়াও একথা অস্বীকার করা যায় না।

অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি।
কেহ কোনরূপে কহে, যেমন যার মতি॥

এই অবতারী শ্রীকৃষ্ণই তত্ত্বের শ্রীকৃষ্ণ। এই বস্তুই প্রকৃত কৃষ্ণ-তত্ত্ব। শ্রীগুরু কৃপায় এই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বেরই আলোচনা করিতেছি। এই তত্ত্বের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তথা কথিত ঐতিহাসিক শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ কি ও কতটা, তত্ত্বালোচনা শেষ হইলেই তার আলোচনা সম্ভব। অব-তারীকে না বুঝিলে, অবতারের মর্ম্ম বুঝা যায় না।

এক অর্থে অবতারের সাহায্য ব্যতীত অবতারীর জ্ঞানলাভও অসম্ভব বটে, কিন্তু সে অবতার অতীত ইতিহাসের অবতার নহেন, বর্ত্তমানের প্রত্যক্ষ অবতার। অন্তরে যদি শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ না হন, তবে তাঁর বাহিরের অবতারের সত্যমিথ্যা, শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠ বুঝিব কেমন

করিয়া ? তিনি দ্বাপরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহা যদি সত্যই হয়, তথাপি দ্বাপরের কথা ত আমরা এই কলিযুগে কেবল কেতাবেই পড়িতে পারি! আর কেতাবে ত কেবল কথাই পাই, বস্তু পাই কৈ ? প্রাচীন শাস্ত্রের কলকাঠি আমাদের বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিতরেই আছে। এই অভিজ্ঞতার অভিধানকে আশ্রয় করিয়াই ঐ শাস্ত্রের অর্থ বুঝিতে হয়। দ্বাপরের কৃষ্ণাবতারের সত্য অর্থ বুঝিতে হইলে, আমাদের সম্মুখে, আমাদের নিজেদের অপরোক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে এই ঘোর কলিযুগে, এই ইংরেজ আমলের সকল প্রকারের নাস্তিক্য ও অনাচারের মাঝখানে আসিয়া অবতীর্ণ হইতে হইবে। প্রাচীন অবতারে সত্যভাবে বিশ্বাস করিতে গেলে আধুনিক অবতারের প্রত্যক্ষলাভ করা প্রয়োজন। কৃষ্ণাবতারের মর্ম্ম বুঝিবার জন্য যেমন চৈতন্যাবতারের প্রয়োজন হইয়াছিল, সেইরূপ চৈতন্যাবতারকে বুঝিবার জন্যও, এই ১৩২১ বঙ্গাব্দে, "মোহান্ত"রূপ সেই চরিত্রের ও সেই তত্ত্বের প্রত্যক্ষ প্রকাশ হওয়া আবশ্যক। ফলতঃ এই অবতার-ধারার কোনও দিন বিচ্ছেদ হয় না। যিনি অবতারী তিনিই প্রতিদিন জীবের অন্তরে "চৈত্যগুরু" ও বাহিরে সদ্‌গুরুরূপে প্রকাশিত হইয়া, তাহাকে সকল তত্ত্বের ও সকল রসের আস্বাদন দিতেছেন। এই প্রত্যক্ষ গুরুতত্ত্বই অবতার-তত্ত্বের কলকাঠি।

ইতিহাসের শ্রীকৃষ্ণ অবতার—বাহিরের বস্তু। তত্ত্বের শ্রীকৃষ্ণ অবতারী, অন্তরের নিত্য বস্তু। তিনি সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা বিদ্যমান। সর্ব্বত্র, সর্ব্বদাই তিনি আপনার লীলাতে আপনি নিমগ্ন। কেউ দেখে, কেউ দেখে না। কিন্তু আমাদের দেখা বা না দেখার উপরে তাঁর সত্তা বা সত্য নির্ভর করে না।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

বাঙ্গলা নাট্যসাহিত্যের পূর্ব্ব-কথা

জগতের প্রাচীন নাট্য-সাহিত্যের মধ্যে ভারতীয় নাট্যের স্থান অতি উচ্চ হইলেও কালবশে এই বিশিষ্ট নাট্যকলা ও নাট্যচর্চ্চা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। গ্রীসে যেরূপ দায়োনিসাস্ দেবের উৎসব উপলক্ষে নাট্যাভিনয়ের সূত্রপাত হইয়াছিল, প্রাচীন ভারতেও সেইরূপ দেবদেবীর পূজা ও উৎসবাদিতেই প্রথম নাট্যাভিনয় আরম্ভ হয়। বৈদিক সাহিত্যের সংবাদগুলি কথোপকথনাকারে গ্রথিত দেখিয়া আধুনিক পাশ্চাত্য সমালোচকগণ অনুমান করিয়াছেন যে, বিশেষ বিশেষ যজ্ঞে ঐ কথোপকথনগুলি বিভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক উচ্চারিত হইত। ইহাই ভারতীয় নাট্যের অতি প্রাচীন রূপ। ভারতীয় নাটকের এই সূচনা হইতে কালক্রমে যে নাট্য-সাহিত্য গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা জগতের অন্য সমস্ত নাট্যসাহিত্য হইতে বিশিষ্ট। কিন্তু ভাস, শূদ্রক, কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি নাট্যকারের রচনা অমর হইলেও তাঁহাদের নাট্যনিচয় সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য না হওয়াতে কালক্রমে ইহাদের জীবনীশক্তি অন্তর্হিত হইয়া গেল। প্রাচীনকালে রাজসভায় বা দেবোৎসবাদিতে অভিনীত নাটকগুলি রচনানৈপুণ্যে মনোহর হইলেও সাধারণ দর্শক তাহাদের সম্যক্ রসগ্রহণ করিতে পারিত না। বিদূষক প্রভৃতি পাত্রের ও রমণীগণের প্রাকৃত ভাষায় কথোপকথনগুলি সাধারণ দর্শকের বোধগম্য হইলেও সংস্কৃত নাটকাবলীর অনুপম শ্লোকসমূহ তাহারা অনায়াসে আয়ত্ত করিতে পারিত না। প্রাকৃতভাষাবহুল নাটকগুলি অধিকতর জনপ্রিয় হইত বটে, কিন্তু কথিত ভাষার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নাটকের ভাষার পরিবর্ত্তন হইল না। আলঙ্কারিকগণ নাট্য-সাহিত্যকে কঠিন নিয়ম-পাশে বাঁধিয়া দিলেন। পরবর্ত্তী সকল নাটকরচয়িতাকেই এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর বিচরণ করিতে হইয়াছিল। কাজেই নাটকগুলি বৈচিত্র্য হারাইয়া, অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়ম

মানিতে গিয়া, কৃত্রিমতাপূর্ণ হইয়া পড়িল ও কালক্রমে তাহাদের ভাষা কথিত ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ হইয়া গেল। সাধারণের মনের উপর কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে না পারিলেও কিছুকাল পর্য্যন্ত সংস্কৃত নাটকগুলি অন্ততঃ শিক্ষিত নৃপতি, অমাত্য, পারিষদ ও পণ্ডিত-মণ্ডলীর আমোদস্পৃহা চরিতার্থ করিত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সংস্কৃত-ভাষার প্রচার বন্ধ হইয়া আসিলে, সংস্কৃত নাটকও ক্বচিৎ রচিত হইতে লাগিল। এইরূপে প্রাচীন ভারতের নাটকগুলি সময়ের পরিবর্ত্তনের সহিত পরিবর্ত্তিত হইতে না পরিয়া প্রাচীন আকার ও নিয়মসকলকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে যাইয়া, সাধারণের সহানুভূতি হারাইয়া বিলুপ্ত হইয়া গেল।

সংস্কৃত ভাণ, প্রহসন প্রভৃতি নাট্যে সাধারণের মনোরঞ্জনের প্রয়াস লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু এ প্রয়াস সফল হয় নাই। কাজেই সংস্কৃত নাট্যাভিনয় কেবল বিশেষ বিশেষ উৎসবের অঙ্গরূপেই বহু-কাল জীবিত ছিল। সংস্কৃতজ্ঞ-পণ্ডিতমণ্ডলী-পরিবৃত রাজারাই এ বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন। অনেকগুলি নাটকের প্রস্তাবনা হইতেই এই কথা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু কালক্রমে এই শ্রেণীর রাজগণও বিরল হইয়া আসিলেন। ভারতে মুসলমান-প্রভাব পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে হিন্দুর নাট্যকলা একরূপ নষ্ট হইয়া গেল। কারণ মুসলমান শাসকগণ তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে নাট্যাভিনয় নিষিদ্ধ বলিয়া নাট্যচর্চ্চায় বিন্দুমাত্র উৎসাহ দান করিতেন না। মুসলমান-প্রভুত্ব-কালেও ভার-তের স্বাধীন হিন্দু নৃপতির অধিকারে মধ্যে মধ্যে নাটক অভিনীত হইত বটে; কিন্তু প্রাচীন আদর্শে গঠিত ও সাধারণের দুর্ব্বোধ্য-ভাষায় রচিত বলিয়া এগুলি সর্ব্বজন-সমাদৃত হয় নাই।

বঙ্গদেশে যে সকল প্রাচীন নাট্যকার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ভট্টনারায়ণ, জয়দেব, রূপগোস্বামী ও কর্ণপূরের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আদিশূরের সমসাময়িক ভট্টনারায়ণ বীররস-প্রধান "বেণীসংহার", জয়দেব "প্রসন্নরাঘব," রূপগোস্বামী "বিদগ্ধমাধব",

"ললিতমাধব" এবং কর্ণপূর "চৈতন্যচন্দ্রোদয়" নাটক রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত "জগন্নাথবল্লভ" প্রভৃতি নাটকও বাঙ্গালার বৈষ্ণবযুগে (১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীতে) রচিত হয়। ভট্টনারায়ণ ব্যতীত আর সকল নাট্যকারই বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব নিজ পার্ষদ-সঙ্গে সাধারণের সমক্ষে কৃষ্ণলীলার ভাবাভিনয় প্রদর্শন করিতেন। তাহাতেই বৈষ্ণবধর্ম্মে সংস্কৃত নাটকের রচনা আদৃত হইয়াছিল। চৈতন্যদেবের শিষ্য রূপগোস্বামী তাই রাধাকৃষ্ণপ্রেমময় 'বিদগ্ধ-মাধব' ও 'ললিতমাধব' নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কর্ণপূরও তাই চৈতন্য-দেবের মাহাত্ম্যব্যঞ্জক 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

কিন্তু এ নাটকগুলি সমস্তই সংস্কৃত ভাষায় ও সংস্কৃত রীতিতে রচিত। কাজেই এ গুলিও সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হয় নাই। সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত নাটক রচিত হইয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু সেগুলি অভিনয়ের উদ্দেশ্যে রচিত হয় না। যাহারা সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালা নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই-একজন সংস্কৃত-রীতি অবলম্বন করিবারই খুব চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই রীতি সর্ব্বসাধারণের প্রিয় না হওয়ায় সেই অবধি বাঙ্গালা নাটকে ইহা চিরপরিত্যক্ত হইয়াছে। বাঙ্গালা নাটক সংস্কৃত নাট-কের বিশিষ্ট রীতি ও পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য নাটকের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে।

বাঙ্গালা নাটকে এই পাশ্চাত্য রীতির প্রতিষ্ঠা কিছুমাত্র বিস্ময়ের বিষয় নহে। কারণ, সংস্কৃত নাটকগুলি যখন বিরলপ্রচার হইয়া আসিল তখন জনসাধারণ প্রথমে যে নাট্যরসের আস্বাদ পাইল, তাহা পাশ্চাত্য জগৎ হইতে আনীত ও তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন। ইংরাজেরা কলিকাতায় নিজেদের চিত্তবিনোদনের জন্য The Play House নামক রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। তথায় নিয়মিতরূপে অভিনয় হইত। সাধারণ বাঙ্গালীর তখন রঙ্গালয় বা নাট্যাভিনয়

সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই অভিজ্ঞতা ছিল না। ভরতপ্রণীত প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রে আমরা "নাট্যমণ্ডপ", রঙ্গপীঠ (stage), প্রেক্ষকপরিষৎ (Auditorium), যবনিকা প্রভৃতির উল্লেখ ও বর্ণনা পাই বটে এবং প্রাচীন ভারতে যে নাট্যাভিনয়ের জন্য রঙ্গালয় নির্ম্মিত হইত তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু ইংরাজের আমলের প্রথমে বাঙ্গালী সে সকল কিছুই জানিত না। অন্যান্য কলাবিদ্যার ন্যায় নাট্যকলাও দেশে লোপ পাইয়াছিল। তাই ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে 'Calcutta Theatre'এ যখন Comedy of Beaux Stratagem, Comedy of Foundling, School for Scandal, Mahomet, প্রভৃতি নাটক ও Like Master like man, Citizen প্রভৃতি প্রহসন অভিনীত হইতে লাগিল, তখন বাঙ্গালী এক নূতন জিনিষ দেখিল। বাঙ্গালীর তখন থাকিবার মধ্যে ছিল এক যাত্রা। পশ্চিমাঞ্চলে এখনও রামলীলা প্রভৃতি উৎসবে, বা বিশেষ বিশেষ পূজাদিতে, দেব-দেবীর বেশে সজ্জিত অভিনেতারা যেরূপ দেবতার লীলাভিনয় প্রদর্শন করিয়া থাকে, সমগ্র ভারতে অল্পবিস্তর এই শ্রেণীর অভিনয়ই প্রচারিত ছিল। রঙ্গপীঠ (Stage) বা প্রেক্ষক-পরিষৎ (Auditorium)-যুক্ত কোনও রঙ্গালয়ের অস্তিত্বের অখণ্ডনীয় প্রমাণ অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।* বাঙ্গালীর যাত্রাও এইরূপ রঙ্গপীঠ ও দৃশ্যপটাদির সাহায্যব্যতিরেকে অনুষ্ঠিত হইত। ১৮২১ সালে "কলি রাজার যাত্রা" অভিনীত হইয়াছিল, এই বার্ত্তা "সংবাদ-কৌমুদী" নামক পত্রিকাতে পাওয়া যায়।† সঙ্গীতের আদর বাঙ্গালী খুবই

---

* রামগড় পর্ব্বতে একটি গুহা কাহারও কাহারও মতে প্রাচীন ভারতের স্থায়ী রঙ্গালয়ের উদাহরণ। কিন্তু এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহরূপে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। (Archaelogical Annual, Vol. II ও প্রবাসী, কার্ত্তিক ১০২১, ৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য,)

† "A new drama called *Kali Raja's Jatra* is being performed."—Calcutta Review. Vol. XIII. P. 160

করিত। সেকালে ঢপ, কীর্ত্তন প্রভৃতি বহুল পরিমাণে কাজেই সে কালের যাত্রাতে কথোপকথন অপেক্ষা গীতের অধিক থাকিত। কৃষ্ণকমল গোস্বামী নবদ্বীপে "নিমাইসন্ন্যাস" ঢাকায় "স্বপ্নবিলাস," "রাইউন্মাদিনী," "বিচিত্রবিলাস", "ভরতমিলন", "সুবল-সংবাদ" প্রভৃতি যাত্রার পালা রচনা করিয়া ও তাহাদের অভিনয় করাইয়া সবিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেন। কিন্তু যাত্রা অধিকদিন ধরিয়া বাঙ্গালীকে তৃপ্ত করিতে পারিল না। ইংরাজদের রঙ্গালয়ে ইংরাজী অভিনয় দর্শনে ও ইংরাজী নাটক পাঠে ইংরাজীশিক্ষিত বাঙ্গালী নূতন ধরণের নাট্যরস আস্বাদন করিতে লালায়িত হইলেন। কিন্তু তখন ইংরাজী নাটকের ন্যায় কোন গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় ছিল না। তাই সর্ব্বপ্রথমে যখন বাঙ্গালীর মনে নাট্যানুরাগ সমুদিত হইল তখন তাঁহারা ইংরাজী নাটকই অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উদ্যোগে হোরেস হে'ম্যান উইলসন্ সাহেব কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষায় অনূদিত সংস্কৃত "উত্তর-রাম-চরিতের" অভিনয় হয়। সংস্কৃত নাটকের অনুবাদের অভিনয়ে দর্শকগণ তৃপ্ত হইবেননা ভাবিয়া, ইঁহারা "উত্তর-রাম-চরিতের" অভিনয়ের পরেই সেক্ষপীয়রের "জুলিয়াস্ সীজার" নাটকের শেষাঙ্ক অভিনয় করেন। পরে এই অভিনেতাগণ জাফর-গুলনেয়ারসম্পর্কিত কোনও দৃশ্যকাব্য অভিনয় করেন, এই কথাও শুনা যায়; কিন্তু ইহার বিশেষ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

এই সময় কলিকাতায় সাঁসুঁসি (Sans Soci) নামক ইংরাজী নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। "সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ হোরেস হে'ম্যান্ উইল্‌সন্ (Wilson), ইংলিশম্যান পত্রিকার সম্পাদক ষ্টকুলার (Stocquler) বোর্ডের সেক্রেটারি টরেন্স (Torrens) এবং কলিকাতার ম্যাজিষ্ট্রেট হিউম (Hume) প্রভৃতি অনেক সুপণ্ডিত সম্ভ্রান্ত এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এই নাট্যশালায় অভিনয় করিতেন।"*

* যোগীন্দ্রনাথ বসু—মাইকেলের জীবনী, ১৭৬ পৃষ্ঠা।

হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ডি, এল্ রিচার্ডসন সাহেব নাট্যানুরাগী ছিলেন ও তিনি ছাত্রদিগকে এই নাট্যশালার ভিনয় দেখিতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিতেন। এই প্রকারে অধ্যাপকের উৎসাহে ও ইংরাজী নাট্যশালার অভিনয় দেখিয়া ছাত্রগণ বিশেষভাবে নাট্যানুরাগী হইয়া পড়ে ও White Houseএ নিম্নলিখিত নাট্যসকল অভিনয় করিয়া যশস্বী হয়,—Merchant of Venice, The King and the Miller, Topsy Tosspot, Lodgings for Single Agent. The Dramatic Aspirant ইত্যাদি। হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের অভিনয় দেখিয়া Oriental Seminaryর ছাত্রগণও উৎসাহিত হইয়া উঠে ও Julius Caesar-এর মহলা দিতে থাকে। কিন্তু নানা কারণে ইহারা উক্ত নাটকের অভিনয় করিতে পারে নাই। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে মেট্রপলিটান একাডেমির ছাত্রগণ জুলিয়াস্ সীজার অভিনয় করে। ইহার কিছুকাল পরে Oriental Seminaryর কতিপয় ভূতপূর্ব্ব ছাত্র সেক্সপীয়রের Othello, Merchant of Venice, ও Henry IV, এবং Amateurs নামক একখানি নাটক অভিনয় করে। এই সমস্ত ইংরাজী নাট্যাভিনয়ই সর্ব্বপ্রথমে সাধারণের নাট্যানুরাগ উৎপাদন করে ও বাঙ্গলা নাটক রচনায় লেখকগণকে প্রবর্ত্তিত করে। রায়গুণাকর ভরতচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালা নাটকে বাঙ্গালীর দ্বারা বাঙ্গলা ভাষায় কথাবার্ত্তা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেন। ভারতচন্দ্র বাঙ্গলা নাটক রচনা করেন নাই। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে "চণ্ডী" নামক যে নাটকখানি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাতে হিন্দী, পারসী ও সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গলা ভাষাও ব্যবহার করিয়াছিলেন। "চণ্ডী" নাটক সংস্কৃত-রীতিতে রচিত। সংস্কৃত নাটকের ন্যায় ভারতচন্দ্র ইহাতে নান্দী, সূত্রধার ও নটীর অবতারণা করিয়া প্রস্তাবনায় নিজের ও তাঁহার প্রতিপালক রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সংস্কৃত নাটকে পাত্র-পাত্রী বিশেষ প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষায় কথাবার্ত্তা

কহিতেন। এই প্রমাণেই বোধ হয় ভারতচন্দ্র চণ্ডীনাটকে বাঙ্গলা, হিন্দী ও পারসী ভাষা প্রয়োগ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। নিম্নোদ্ধৃত যে অংশটুকুমাত্র ভারতচন্দ্র লিখিয়া যাইতে পারিয়াছেন, তাহা হইতে বোধ হয় যে, নাটকখানি সম্পূর্ণ হইলে এক অদ্ভুত জিনিষ হইত। বহুবিধ ভাষার এরূপ একত্রসমাবেশের উদাহরণ অত্যন্ত বিরল।

চণ্ডী নাটক।

[সূত্রধার এবং নটীর রাজসভায় প্রবেশ]

সংগায়ন্ যদশেষ কৌতুককথাঃ পঞ্চাননো পঞ্চভি-
র্বক্তৈ-র্বাস্তবিশালকৈর্ডমরুকোত্থানৈশ্চ সংনৃত্যতি ।
যা তস্মিন্ দশবাহুভির্দশভুজা তালং বিধাতুং গতা
সা দুর্গা দশদিক্ষু বঃ কলয়তু শ্রেয়াংসি নঃ শ্রেয়সে ॥

[নটীর উক্তি]

শুন শুন ঠাকুর নৃত্য বিশারদ সভাসদ সারি চতুরী।
নূতন নাটক নূতন কবিকৃত হাম তোঁহি নূতন নারী ॥
ক্যায়সে বাতায়ব ভাব ভবানীকো ভাতি ভৈঁ মুঝে ভারি।
দানব-দলনে ধরণী-মণ্ডলে তারিণী লে অবতারি ॥
গুরুসম ধীর বীরসম শুনহ সম সগুণ মুরারি।
কৃষ্ণচন্দ্র নৃপ রাজ-শিরোমণি ভারতচন্দ্র বিচারি ॥

[সূত্রধারের উক্তি]

রাজ্ঞোঽস্য প্রপিতামহো নরপতী রুদ্রোঽ ভবদ্রাঘব—
স্তৎপুত্রঃ কিল রামজীবন ইতি খ্যাতঃ ক্ষিতীশো মহান্।
তৎপুত্রো রঘুরামরায়নৃপতিঃ শাণ্ডিল্যগোত্রাগ্রণী—
স্তৎপুত্রোঽয়মশেষধীরতিলকঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রো নৃপঃ ॥
ভূপস্যাস্য সভাসদো বিমলধীঃ শ্রীভারতো ব্রাহ্মণো।
ভূরিশ্রেষ্ঠপুরে পুরন্দরসমো যত্তাত আসীন্নৃপঃ।